Rajshahi University journal of arts & law Vol. 48 (2020) pp. 27-55
ISSN 2309-0898

পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে আইনগত দুর্বলতা[১]

মো. আব্দুর রহিম মিয়া[*]

Abstract

In Bangladesh, family courts were established by the Family Courts Ordinance (FCO), 1985 to assist the smooth and effective disposal of cases relating to family matters. Establishment of the Family Courts, a long demand of the people, in Bangladesh was a landmark step. At present, the Family Court of Bangladesh is governed by a limited number of Family Laws. The jurisdiction of the family courts is limited according to the FCO. The FCO is not flawless, and the flaws gave rise to some confusions and uncertainties. Limited application of the Code of Civil Procedure, 1908 in the Family Courts creates obstacles for access to justice. There are many loopholes and shortcomings in the FCO and other family laws which impede smooth functioning of the family courts. The FCO does not explicitly empower Courts to grant injunctions to prevent domestic violence. The FCO includes provision for forming and establishing separate family courts to deal exclusively with family disputes. Nonetheless, surprisingly no separate family court has been established yet, rather the court of Assistant Judge has been working as the Family Court Judge but the court of Assistant judge is already overburdened with other civil suits. The present FCO does not include any provision relating to counseling support service which is extremely necessary for providing assistance to the parties in resolving family disputes. Therefore bringing reforms in FCO is urgently required at the present moment. This article examines the loopholes in the FCO and other family laws of Bangladesh and suggests reforms for addressing the weaknesses of these laws.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে বিদ্যমান পারিবারিক আইনসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ১৯৮৫ সালে জারী করা হয় পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশের অধীনে বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, মোহরানা, ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত পারিবারিক মামলাসমূহ স্বল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় পারিবারিক আদালত। প্রতিষ্ঠার পর প্রায় তিন যুগ সময় পেরিয়ে গেলেও এই আদালত প্রত্যাশা পূরনে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশসহ বিদ্যমান পারিবারিক আইনসমূহের নিজস্ব ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতার কারনে পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে 'সহবাসের প্রমাণ', 'বিবাহের ঘোষনা', 'বৈবাহিক অবস্থার ঘোষনা', 'সন্তানের বৈধতা' সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং বিষয়গুলো পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের আওতাভূক্ত না হওয়ায় পক্ষগনকে নানা রকম হয়রানীর মুখোমুখি হতে হয়। সংসারে ও পরিবারের সম্পত্তিতে নারীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকার পরেও বাংলাদেশে বিবাহত্তোর নারীর সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার বা তালাক পরবতীতে এর বন্টন বিষয়ে কোন স্বীকৃতি, সংজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কোন দেওয়ানী বা ব্যক্তিগত আইন বা কোন বিধিমালা নেই। সমন জারী, অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদানে

---

[১] This paper is a modified version of a research project submitted at the University of Rajshahi in 2018.

[*] প্রফেসর, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, Email: arahimlaw@yahoo.com

আদালতের ক্ষমতা, বিদেশে বসবাসকারী বিবাদীর বিপক্ষে ডিক্রি-জারী সংক্রান্ত বিষয়ে আইনগত জটিলতার কারণে পারিবারিক মামলা নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয়। অধ্যাদেশ জারির পর স্বতন্ত্র কোনো আদালত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, বরং দেওয়ানী এখতিয়ারসম্পন্ন সকল সহকারী জজ আদালতকে পারিবারিক আদালত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে ভরণপোষণের পরিমাণ বা শর্তের ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। অধ্যাদেশে স্ত্রী ও শিশুদের ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকলেও বৃদ্ধ ও দরিদ্র পিতামাতার ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিরোধের মামলা নিষ্পত্তি করার কোন বিধান নেই। ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পারিবারিক আদালতসহ অন্যান্য একাধিক আদালতের এখতিয়ার যুগপথভাবে কার্যকর থাকায় মামলা নিষ্পত্তিতে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। পারিবারিক মামলায় Pleadings (আরজি, জবাব) সংশোধনের ক্ষেত্রে বিধানের অভাব পারিবারিক আদালতের কার্যক্রমে বাঁধা সৃষ্টি করছে। বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নে সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পক্ষসমুহের আদালতে যাবার বিধান মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়নি। এমন ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনার জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে কিনা- বিষয়টি অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়নি। অধ্যাদেশে উল্লেখিত দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় এবং সার্বজনীন পলিসি এবং সংবিধানের পরিপন্থী। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে আরজি ও আরজি জবাব দাখিলের জন্য সুনির্দিষ্ট ছক তৈরীর বিধান নেই। এছাড়াও পারিবারিক আদালতে কোর্ট ফির পরিমাণ, মুলতবি খরচ, মধ্যস্ততা নিয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা বিষয়ে পারিবারিক আইনে অস্পষ্টতা রয়েছে। ক্রটিপূর্ণ আইন ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে সর্বদা বাঁধা হিসেবে কাজ করে। একারনে আইনের দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য আইন সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়। অত্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশকে পরিপূর্ণ বিশ্লেষণপূর্বক অধ্যাদেশটিসহ পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পারিবারিক আইনসমূহের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতা নির্দেশ করার পাশাপাশি পারিবারিক মামলার আইনগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে পরামর্শ প্রদান করা।

২. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

বাংলাদেশে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠার পূর্বে পারিবারিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আলাদা কোন আদালত ছিল না। একই আদালতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা হতো। পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অধ্যাদেশে উল্লেখিত পারিবারিক বিরোধসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করার পরিবেশ তৈরী হয়েছে। এই আদালতের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশেষতঃ দরিদ্র মহিলাদের স্বল্প ব্যয়ে মামলা দায়ের করার সুযোগ সৃষ্টি ও অল্প সময়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পারিবারিক আদালত উপযুক্ত মনে করলে এই অধ্যাদেশের অধীনে মামলার সম্পূর্ণ বিচার কার্যক্রম বা যে কোন অংশ রুদ্ধদ্বার কক্ষে করতে পারে।[১] পূর্বে এইরুপ ব্যবস্থা না থাকায় অনেকে পারিবারিক গোপনীয়তা প্রকাশিত হবার লজ্জায় আদালতের দারস্থ হতেন না। এই অধ্যাদেশ অনুসারে পর্দানশিন মহিলা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করতে পারেন।[২] এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিটি সহকারী জজ আদালতকে পারিবারিক আদালত হিসেবে গন্য করা হয়[৩] এবং যে পারিবারিক আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে সমস্যা উদ্ভূত হয়, সেই আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়।[৪] তবে বিবাহবিচ্ছেদ, মোহরানা ও ভরণপোষণের ক্ষেত্রে যেখানে স্ত্রী বসবাস করেন, সেই এলাকায় বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যায়।[৫] এই অধ্যাদেশ বলে আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে বাদী ও বিবাদী আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশিত হন।[৬] বিচারের সুবিধার্থে হাইকোট বিভাগ যেকোনো আদালতে এবং জেলা জজগণ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে যেকোনো আদালতে মামলা স্থানান্তর করতে

পারেন।[৭] পারিবারিক আদালতে সব ধরনের মামলার ক্ষেত্রে একই পরিমাণ টাকা কোর্ট ফি দিতে হয়।[৮] পারিবারিক মামলার আরজিতে আদালতের নাম, বাদীর নাম ও ঠিকানা, বিবাদীর নাম ও ঠিকানা, নালিশের কারণ সর্ম্পকিত তথ্য, বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার ও বাদীর দাবীর সমর্থনে দলিলের বিবরন উল্লেখ করতে হয়। এছাড়াও পারিবারিক মামলার বিরোধ সম্মন্ধীয় বিষয়ের বিস্তারিত তথ্যসহ একটি তফসিল দিতে হয় যেখানে আরজির সমর্থনে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক সাক্ষীগনের নাম ও ঠিকানা অন্তর্ভূক্ত থাকে। আরজির সাথে তফসিল দেয়া না হলে, সমন জারীর খরচ এবং নোটিশের জন্য পোস্টাল খরচ পরিশোধ করা না হলে কিংবা নির্ধারিত কোর্ট ফি জমা দেয়া না হলে আদালত আরজি অগ্রাহ্য বা নাকচ করতে পারে।[৯] পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে কোনো বিরোধের সমাপ্তি হলে উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত আপোষ মীমাংসার আলোকে আদালত মামলার ডিক্রি বা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করার পর রায় ঘোষণার পূর্বে পারিবারিক আদালত পক্ষগণের মধ্যে শেষ পর্যায়েও আপোষ মীমাংসার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১০] যদি অনুরূপ আপোষ বা পুনর্মিলন সম্ভবপর না হয়, তা হলে আদালত তখনই অথবা ভবিষ্যতে অনধিক সাত দিনের মধ্যে যেকোনো দিনে রায় ঘোষণা এবং ডিক্রি প্রদান করতে পারেন।[১১] পারিবারিক আদালতের রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে সীমিত পরিসরে আপিল করার সুযোগ আছে।[১২] এছাড়াও অধ্যাদেশটির মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান সকল আইনের উপরে এই অধ্যাদেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[১৩]

২.১ পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য সর্ম্পক পূনরুদ্ধার, মোহরানা, ভরণপোষণ ও সন্তানের অভিভাকত্ব সম্পর্কিত ৫টি কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিরোধের প্রতিকার চেয়ে পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করা যায়।[১৪] নিম্নে আদালতের এখতিয়ারভূক্ত বিষয়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আইনসমূহ বিশ্লেষণ করা হলোঃ

২.১.১ বিবাহ বিচ্ছেদ

বাংলাদেশে স্বামী ও স্ত্রী স্বেচ্ছায় আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া এবং শুধুমাত্র স্ত্রীপক্ষ আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।[১৫] বিবাহবিচ্ছেদের জন্য সব সময় আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বামী তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।[১৬] বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামীর ক্ষমতা একচ্ছত্র, তবে একজন স্বামী ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছেদ করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে বিবাহের কাবিননামায় ১৮ নম্বর ঘরে স্ত্রীকেও তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।[১৭] এ ছাড়াও স্ত্রী যদি স্বামীকে 'খুলা' বা 'মোবারাত' বিচ্ছেদে সম্মত করাতে পারেন, সেক্ষেত্রেও তালাকের জন্য আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের ২ নং ধারা অনুযায়ী ৯টি কারণের[১৮] যেকোনো একটি কারণে স্ত্রী আদালতে তালাক প্রার্থনা করতে পারেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকারী হন। এজন্য তাকে স্বামীর কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। শুধু স্ত্রীর ক্ষমতাই নয়, স্বামীর ইচ্ছামাফিক বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার যেন যথেচ্ছ প্রয়োগ করা না হয় সেজন্য ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭ নং ধারায় বিধান করা হয়েছে। উক্ত ধারানুসারে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে তালাক ঘোষণার পর তাকে যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশ পাওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান একটি সালিশী পরিষদ গঠন করে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন নতুবা তালাকটি অনুমোদন করবেন। আইনানুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ প্রদানের তারিখ হতে ৯০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হয়না। মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৭(১)

নং ধারা অনুসরন না করলে স্বামী শাস্তি[১৯] পাবে ঠিকই, কিন্তু তালাক বাতিল হয়না। **১৯৬১** সালের অধ্যাদেশে কোথাও নোটিশ প্রদান না করলে তালাক কার্যকর হবে না এই বিধান উল্লেখ নাই।[২০] অন্যদিকে সালিশী পরিষদ কর্তৃক যদি সমঝোতা না হয় কিংবা সালিশী পরিষদ যদি আলোচনায় না বসে তবে নোটিশ প্রদানের দিন থেকে ৯০ দিন পরে তালাক কার্যকরী হয়। তালাকের সঙ্গে জড়িত থাকে দেনমোহর, ভরণ-পোষণ ও সন্তানের জিম্মা নেওয়ার বিষয়। তালাক হয়ে যাওয়ার পরও এ বিষয়গুলো নিয়ে মামলা হয়। যা নিস্পত্তিতে অনেক সময় লেগে যায়। তাই এ বিষয়ে সরকার সালিশী পরিষদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে একটি গাইডলাইন বা বিধি প্রণয়ন করতে পারে যাতে করে তালাকের আবেদনের সাথে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সালিশী পরিষদের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয় এবং এর ফলে পারিবারিক আদালতের উপর মামলার চাপ কমবে। বহুবিবাহ ও ভরনপোষনের ক্ষেত্রে সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনার জন্য আদালতে যেতে পারলেও[২১] বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নে সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পক্ষসমুহের আদালতে যাবার বিধান অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে আইনী বিধানের অনুপস্থিতিতে অনেক সময় সংক্ষুব্ধ পক্ষ সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মনে করতে পারে। একারনে সংক্ষুব্ধ পক্ষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এমন ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনার জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে কিনা বিষয়টি আইনে পরিষ্কার করা প্রয়োজন।[২২] এছাড়াও অধ্যাদেশটিতে সালিশী পরিষদের জবাবদিহিতা মূলক বিধানের অনুপস্থিতির কারনে অনেক ক্ষেত্রে সালিশী পরিষদ কর্তৃক তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

২.১.২ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার

মুসলিম আইনে বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর সাথে বা স্বামী স্ত্রীর সাথে বসবাস না করাকে চুক্তি ভঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়, যার প্রতিবিধান স্বরূপ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি এসেছে।[২৩] দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের অধিকার হলো স্বামী-স্ত্রীর একত্রে থাকার অধিকার।[২৪] কোনো বৈধ কারণ ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর সংসার ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিলে এবং স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বর্জন করলে স্বামী পারিবারিক আদালতে স্ত্রীকে ফেরত পাওয়ার জন্য মামলা করতে পারেন।[২৫] কোনো স্বামীও যদি কোনো আইনসংগত কারণ ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস বন্ধ করে দেন, সেক্ষেত্রেও ঐ স্ত্রী আদালতে দাম্পত্য অধিকার ফিরত চাইতে পারেন। স্ত্রীরও অধিকার আছে স্বামীকে বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার। তবে এরুপ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মামলা শুধু বিবাহ বলবৎ থাকা অবস্থাতেই করা যায়।[২৬] দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের অধিকার স্বামী বা স্ত্রী দুজনেরই আছে, কিন্তু খুব অল্প ক্ষেত্রেই স্ত্রী তা প্রয়োগ করতে পারে। স্বামীর একচ্ছত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতার কারণে এই অধিকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।[২৭] **১৯৮৫** সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের অধীনে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মামলায় প্রতিকার হলো এর ডিক্রি যার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে, সে যদি আদালতের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়, তবে তার সম্পত্তি জব্দ করা।[২৮] ফলে অনেক ক্ষেত্রে মামলা করার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয় না। কারণ এভাবে ডিক্রি জারী করেও স্ত্রীকে স্বামীর সাথে বসবাস করতে বাধ্য করা যায় না। হাইকোর্টের একটি মামলার রায়ে বিচারপতি বলেন,

> ... যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি, সেখানে স্বামী বা স্ত্রী দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মামলা করতে পারেন এবং এই মামলায় যদি ডিক্রি হয়, তবে তার বাস্তবায়ন হতে পারে দায়িকের সম্পত্তি জব্দ করে নেওয়ার মাধ্যমে। তবে সমস্যা হয় দায়িক যদি স্ত্রী হন। কারণ আমাদের দেশে বেশিরভাগ মেয়েদের কোনো সম্পত্তি থাকে না। ফলে এ ক্ষেত্রে ডিক্রি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। আর আদালতের এমন কোনো রায় দেয়া উচিত না, যার কোনো বাস্তবায়ন নেই। কাজেই বলা যায়, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি আইনের একটি খারাপ অংশ।[২৯]

নেলী জামান বনাম গিয়াসউদ্দিন খান মামলায়[৩০] রায়ে বলা হয় যে, *দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় এবং সার্বজনীন পলিসি এবং সংবিধানের পরিপন্থী*। অন্য একটি মামলায়[৩১] বিচারপতি বলেন *'স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর সঙ্গে বসবাসে বাধ্য করার বিষয়টি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নীতি এবং পলিসির পরিপন্থী অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে নারী- পুরুষের সমান অধিকার, আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার, যা বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ এবং ৩১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুরক্ষিত, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়'*। খোদেজা বেগম এবং অন্যান্য বনাম মোঃ সাদেক সরকার[৩২] মামলায় বিচারপতি বলেন *'এটি একটি অমানবিক আইন, যেখানে স্বামী বা স্ত্রীকে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে বা স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করুক না কেন, এটা অবৈধ এবং বাতিল আইন এবং এর অধীনে কোন মামলা আদালতে চলতে পারে না'*। শুধুমাত্র একটি মামলায়[৩৩] বিচারপতি আগের ৩টি মামলা থেকে সম্পূর্ন বিপরীতধর্মী রায় দিয়ে প্রাগত আইনকে প্রতিষ্ঠা করে বলেন *'দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের অধিকার পারস্পরিক এবং এটি বৈষম্যমূলক নয় বা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়'*। তবে তিনি তার রায়ে 'আদালতের দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার বিষয়ে ডিক্রি দেওয়া উচিত কিনা কিংবা যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সমঝোতাই নেই এবং তা বাস্তবায়ন করা অবাস্তব ও অসম্ভব কিনা'- সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। মামলাগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উচ্চ আদালত দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে একমত হননি। যদিও কোন কোন আদালত মামলা চলবে বলে রায় দিয়েছেন আবার কোন কোন আদালত রায়ে বলেছেন এধরনের মামলা চলতে পারে না তবে একটি বিষয়ে প্রায় সবাই একমত হয়েছেন, তা হলো স্ত্রীকে স্বামীর সাথে বসবাস করার জন্য বাধ্য করা যায় না এবং এ ধরণের মামলায় ডিক্রি হলে তার বাস্তবায়নও সম্ভব হয় না। যেহেতু এ বিষয়ে আদালতে সংঘাতপূর্ণ রায় আছে এবং এই বিধানটি ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং সেদিক থেকে সংবিধানও লংঘন করেছে বিধায় এটি পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ থেকে বাদ দিয়ে সেখানে আপোষ-মীমাংসার প্রাক্কালে প্রয়োজন অনুসারে বিচারক তালাক সংক্রান্ত বিষয় নিস্পত্তির সময় নিজস্ব বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারকে গুরুত্ব দিতে পারেন।

২.১.৩ মোহরানা

মোহরানা হলো নির্দিষ্ট পরিমান টাকা বা সম্পত্তি যা বিবাহের প্রতিদান হিসেবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে পরিশোধ অথবা সরবরাহ করা হয়।[৩৪] এমনকি বিবাহ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে মোহরানা নির্ধারিত না হলেও বা স্ত্রী পরবর্তীতে কোনো দেনমোহর দাবী করবে না এ শর্তেও যদি মোহরানা নির্ধারন করে বিবাহ অনুষ্টিত হয়, সেক্ষেত্রেও আইন স্ত্রীর মোহরানার অধিকার নিশ্চিত করে।[৩৫] মোহরানা যদি স্বামীর জীবদ্দশায় পরিশোধ বা আদায় না হয় কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে স্বামীর সম্পত্তি দখলে রেখে সম্পত্তি হতে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে মোহরানা আদায় সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে স্ত্রী কিংবা স্ত্রীর অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারীরা যদি চায় তবে আদালতে মামলা দায়ের করে মোহরানা আদায় করতে পারে।[৩৬] আবার স্বামীর জীবদ্দশায় স্বামীর কাছে মোহরানা দাবী করে না পেলে, সেক্ষেত্রেও স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মোহরানার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। স্বামীর মোহর প্রদানে ব্যর্থতায় স্ত্রী ডিক্রী জারী মামলা করলে আদালত ডিক্রীকৃত টাকা আদায়ের জন্য পরোয়ানা জারী করে এবং এক্ষেত্রে বিবাদী কর্তৃক অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ডের বিধান রয়েছে।[৩৭] উর্ধ্বদিকে দেনমোহরের কোন সীমা নির্দিষ্ট করা নাই। উহা আকাশচুম্বি হতে পারে কিংবা স্বামীর আয়ের বহুগুন উর্ধ্বেও হতে পারে। উহা যত উচ্চই হোক না কেন আদালত উহা ন্যায্য ঋণ ধার্য করেই উহার জন্য ডিক্রী প্রদান করবে, এমনকি উক্ত ঋণ পরিশোধ করার পর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার মতো যদি কোন সম্পত্তি নাও থাকে তাহলেও সম্পূর্ণ দেনমোহর ডিক্রী দিতে আদালত বাধ্য থাকবে।[৩৮]

আদালতের কোনক্রমেই উক্ত দেনমোহরকে হ্রাস করার ক্ষমতা নাই।[৩৯] যেহেতু দেনমোহর স্ত্রীকে স্বামীর তালাক হতে রক্ষা করে, তজ্জন্য যত উচ্চই হোক না কেন, আদালত উহা মঞ্জুর করবে।[৪০] দেনমোহরের ক্ষেত্রে টাকার মুল্যমান অতীত ও বর্তমান সমান। অথচ টাকার মূল্যমান প্রতিনিয়ত অবমূল্যায়ন হচ্ছে। ফলে স্বল্প মূল্যের দেনমোহরের জন্য অনেকেই মামলা করতে চায়না।[৪১] বাংলাদেশে আদালতের দীর্ঘসুত্রিতাও দেনমোহরের মামলায় মহিলাদের অনাগ্রহের অন্যতম কারণ। পারিবারিক আদালতে একটি মামলা করলে তার সাথে অনেক বিষয় জড়িত থাকে। একটি মামলা চালাতে গিয়ে অনেক সময় প্রত্যাশিত মোহরানার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়। আবার মোহরানার মামলার ক্ষেত্রে দুটি মামলা করতে হয়;[৪২] যা স্ত্রীদের মোহরানার অধিকার নিশ্চিতকরণে দীর্ঘসূত্রিতাসহ নানারকম সমস্যা তৈরী করে। মোহরানার পরিশোধ না করার জন্য স্বামীদের যে শাস্তির বিধান আইনে রাখা হয়েছে তা খুবই নগন্য। ফলে এদেশে অনেক স্বামী মোহরানাকে এড়িয়ে চলছে আইনের তোয়াক্কা না করেই। বিবাহের পরে বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতার কারণে যেহেতু মোহরানার অধিকার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, সে কারণে আইন পাশ করে বিবাহের সময়েই অথবা বিবাহের অব্যবহিত পরেই নির্দিষ্ট কিছুদিনের মধ্যেই মোহরানা আদায়ের ব্যবস্থা করা দরকার।[৪৩]

২.১.৪ অভিভাবকত্ব ও হেফাজত

নাবালক সন্তানের দেহ ও সম্পত্তির আইনসম্মত ও স্বাভাবিক অভিভাবক হলেন পিতা। পিতার অবর্তমানে নাবালক সন্তানের দাদা; দাদার অবর্তমানে বা অপারগতায় নাবালকের মাতাসহ মাতাপিতার নিকটতম আত্মীয় অভিভাবক হতে পারেন। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জেলা জজ নাবালকের দেহ ও সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত হতেন। বর্তমানে এ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আদালতের সহকারি জজের ওপর অর্পিত হয়েছে। আইনগত অভিভাবকের অবর্তমানে বা অনুপস্থিতিতে কোনো আগ্রহী ব্যাক্তি নাবালকের দেহ বা সম্পত্তি অথবা উভয়ের অভিভাবক হতে চাইলে তাকে ১৮৯০ সালের অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন অনুযায়ী পারিবারিক আদালতে আবেদন করতে হয়। এই আইন সন্তানের কল্যাণ[৪৪] বিবেচনায় রেখে অভিভাবকত্ব নির্ণয়ের বিষয়টি আদালতের মাধ্যমে নির্ধারণ করার সুযোগ রেখেছে।[৪৫] আইনগত বিবাহ বিচ্ছেদের পর ছেলের সাত বছর বয়স এবং মেয়ের বয়োসন্ধি পর্যন্ত মা-ই সন্তানকে পালন করতে পারেন।[৪৬] উপযুক্ত বয়সসীমার নিচে যদি সন্তানের বয়স হয় এবং বাবা যদি মায়ের কাছে সন্তানকে না রাখতে দেন, তবে মা পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারেন। বাংলাদেশে অভিভাবকত্ব ও হেফাজত সংক্রান্ত বিষয় অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ এবং মুসলিম শরীয়াহ্ আইন দিয়েই পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রচলিত শরীয়াহ্ আইনের বাইরে এসে সন্তানের স্বার্থ সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত আবুবকর সিদ্দিকি বনাম এস. এস. এ বকর[৪৭] মামলায় ছেলের বয়স ৭ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মাকে সন্তানের হেফাজত করার ক্ষমতা দেন। আবার মা যদি অন্য কাউকে বিবাহ করেন তবে সন্তানের হেফাজত করার ক্ষমতা এবং অভিভাবকত্ব হারান এই নীতি থেকেও বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সরে এসে জোহরা বেগম বনাম মাইমুনা খাতুন[৪৮] মামলায় বলেছেন কেবলমাত্র কোন আগন্তুককে বিয়ে করলেই মা তার সন্তানকে হেফাজত করার ক্ষমতা হারাবেন তা নয় বরং পরিস্থিতি বিবেচনায় মাকে সন্তানের অভিভাবকও ঘোষণা করা যায়। মুসলিম আইন মোতাবেক পিতাই সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক।[৪৯] কিন্তু কোন কারণে যদি পারিবারিক আইন এবং সন্তানের স্বার্থ এর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তবে, আয়েশা খাতুন বনাম মেজর সাব্বির আহমেদ মামলার[৫০] সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেক্ষেত্রে সন্তানের স্বার্থই প্রাধান্য পাবে। অভিভাবকত্বের বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র এবং অনুসরণীয় সিদ্ধান্ত দেয়া হয় রেহানুদ্দিন বনাম আজিজুন নাহার[৫১] মামলায়। মুসলিম আইন মোতাবেক পিতার অনুপস্থিতিতে দাদা নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক কিন্তু এই মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতি

বিবেচনা করে মাকে সন্তানের অভিভবকত্ব দেয়া হয়। নাবালকের হেফাজতের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকারকে এতটাই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে হেফাজতের অধিকার স্বামীকে না প্রদান করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও নারগিস সুলতানা বনাম মোঃ আমিরুল চৌধুরী[৫২] মামলায় বিচারক সন্তানকে মায়ের হেফাজতে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেন। অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনে সন্তানের স্বার্থ বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আদালতের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।[৫৩] একারনে আদালত অবস্থা এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সন্তানের সর্বোচ্চ স্বার্থ বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তবে প্রচলিত আইনও বর্তমান থাকায় এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য বিধিবদ্ধ আইনকে আরও যুগোপযোগী ও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। অন্যান্য মুসলিম দেশে সন্তানের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে পিতা মাতাকে দেখে নয়, বরং কার কাছে থাকলে সন্তানের মঙ্গল হবে, সে বিষয়টিতেই অধিক নজর দিয়েছে। যেমন তিউনিসিয়ায় মায়ের পক্ষে হেফাজতে সন্তানের কোন বয়সসীমা রাখা হয়নি।[৫৪]

২.১.৫ ভরণপোষণ

ভরণপোষণ বা নাফাফা' বলতে বুঝায় খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। মুসলিম আইনে বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী এবং রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সন্তান ভরণপোষণের অধিকারী হন।[৫৫] পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ অনুযায়ী পিতা-মাতাও ভরণপোষণের অধিকারী। ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিজের ও নাবালক সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর মামলা করার অধিকার আছে।[৫৬] স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে ইচ্ছাকৃত অপারগ থাকেন, তাহলে স্ত্রী যেদিন থেকে ভরণপোষণের টাকা দাবি করবেন, সেদিন থেকে তিন বছরের মধ্যে পারিবারিক আদালতে মামলা করতে হবে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুসারে, স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হলে কিংবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদেরকে সমভাবে ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হলে স্ত্রী স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে এই বিষয়ে আবেদন করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সালিশি পরিষদ গঠন করে ভরণপোষণের পরিমান ঠিক করবেন এবং সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। ঐ স্বামী কিংবা স্ত্রী নির্ধারিত পন্থায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক উক্ত সার্টিফিকেট পুনর্বিবেচনার জন্য পারিবারিক আদালতের নিকট আবেদন পেশ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন আদালতে এই সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে না।[৫৭] এছাড়াও মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ অনুযায়ী স্বামী দুই বছর ধরে ভরণপোষণ প্রদানে ব্যর্থ হলে বা অবহেলা করে ভরণপোষণ না দিয়ে থাকলে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়ার জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা করার অধিকারী হবেন।[৫৮] সন্তানদের ভরণপোষণ দেয়ার দায়িত্ব আইনগতভাবে পিতার। সাবালক হওয়া পর্যন্ত ছেলেকে এবং বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মেয়েকে পিতা ভরণপোষণ দিবেন। কোনো অসুস্থ ও অক্ষম সন্তান কিংবা ভরণপোষণ যোগাতে ব্যর্থ সন্তান সাবালক হলেও তাদের ভরণপোষণও দিবেন পিতা। মা যখন সন্তানের জিম্মাদার তখনও পিতা ভরণপোষণ দিবেন। অবস্থাভেদে সন্তানেরাও ভরণপোষণ পাওয়ার জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা করার অধিকারী।

মুসলিম আইন অনুযায়ী দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকা অবস্থায় স্ত্রীদের ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার আছে কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ নোটিশের তারিখ থেকে পরবর্তী ৯০ দিন পর্যন্ত অথবা স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী ভরণপোষণ পাবেন।[৫৯] মুসলিম পারিবারিক আইনে স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ না থাকলেও বাস্তবে এমন মামলাও রয়েছে যেখানে স্বামীরা তাদের স্ত্রী 'অসতী' 'কর্তব্যবিমুখ' বা 'চরিত্রহীন' ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে ভরণপোষণের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে থাকে।[৬০] বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে ভরণপোষণের পরিমাণ বা

শর্তের ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। বাংলাদেশের বিচারকগণ রায় প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামীর ভরণপোষণ দেওয়ার সামর্থ্য এবং স্ত্রীর অভাব অভিযোগকে বিবেচনায় নিয়ে থাকেন। কিন্তু স্বামীর সামর্থ্য বা স্ত্রীর অভাব নির্ধারণের মানদণ্ড পারিবারিক আইনে বেশ অস্পষ্ট। অনেক সময় দেখা যায়, সাধারনত দাম্পত্য সম্পর্কের মেয়াদ, দম্পতির নির্ভরশীল পক্ষের (এ ক্ষেত্রে সাধারণত স্ত্রীর) শিক্ষালাভ এবং উপার্জন ক্ষমতার উপর পরিবারের শিশু পরিচর্যা ও সাংসারিক দায়-দায়িত্বের প্রভাব, স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্ভাব্য আয়, নির্ভরশীল পক্ষের (স্ত্রীর) নিজেকে নিজে ভরণপোষণের সামর্থ্য, স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য এবং বয়স, নির্ভরশীল পক্ষের চাহিদা/ অভাব এবং জীবনযাত্রার মান, জীবন-জীবিকার অন্যান্য উপায় এবং অপর পক্ষের পেশাগত উন্নয়নে নির্ভরশীল পক্ষের অবদান প্রভৃতি বিষয় মানদণ্ড হিসেবে গন্য করা হয়ে থাকে।[৬১] তাছাড়া যেসব নারী ভরণপোষণের বা মোহরানা প্রাপ্তির লড়াইয়ে জয়যুক্ত হন, তাদের লড়াই কিন্তু শেষ হয় না। স্বামীর কাছ থেকে পাওনা আদায়ের জন্য নারীকে রায় কার্যকর করার আদেশ বাস্তবায়নের আবেদন করতে হয় এবং স্বামীর সম্পদ ও আয়ের প্রমাণাদি দাখিল করতে হয়। এই কাজটি অধিকাংশ নারীই করতে পারেন না। অনেকক্ষেত্রে আবেদন করার পর বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলেও তারা আদালতের রায় বাস্তবায়নের আদেশ পাননা। ভরণপোষণের রায় প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে ২০১০ সালে বাংলাদেশ আইন কমিশন একটি সুপারিশ পেশ করে। সেটি হলো, প্রাথমিক অবস্থায় ভরণপোষণ দাবির পাশাপাশি ভরণপোষণের রায় বাস্তবায়নের জন্যও আগাম আবেদন পেশ করা যাবে।[৬২] তবে সরকার এখনও এ বিষয়ে অধ্যাদেশে কোনো সংশোধনী গ্রহণ করেনি। ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পারিবারিক আদালতের বিচারকদের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সুর্নিদিষ্ট মানদণ্ড সংক্রান্ত বিধান এবং স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকারের সাথে তার 'আনুগত্য', 'সতীত্ব', 'বৈবাহিক কর্তব্য', অথবা 'চারিত্রিক সততা' প্রভৃতি মানদণ্ডের সম্পর্ক থেকে বিলুপ্ত করা সংক্রান্ত বিধান এখনও পারিবারিক আইনে সন্নিবেশিত করা হয়নি এবং একারনে ভুক্তভোগী মহিলারা নানারকম হয়রানীর শিকার হচ্ছেন।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলেও বিবাহ-বিচ্ছেদের পর স্ত্রী কিছুদিন ভরণপোষণ পান। বাংলাদেশের সুপীমকোর্টের *Hifjur Rahman vs. Shamsunnahar Begum* মামলায় রায় অনুযায়ী যেদিন থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ কার্যকরী হয় সেদিন থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত স্ত্রী ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হন এবং এই মামলায় আদালত অভিমত ব্যাক্ত করেন যে মাতাহ[৬৩] বা ভরণপোষণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা ইদ্দতের পরেও সম্প্রসারিত করলে শরীয়াহ্ বিরোধী হবে না।[৬৪] পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

> '------for divorced women maintenance should be provided on a reasonable scale. This is a duty on the righteous'.[৬৫]

বিবাহ বিচ্ছেদের পর কতদিন পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে বাধ্য থাকবেন এ বিষয়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট মো. আহমেদ খান বনাম শাহ বানু বেগম মামলায়[৬৬] রায় দেন যে তালাকের পরও একজন মহিলা তার দ্বিতীয় বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বের স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পেতে অধিকারী হবেন, যদি তিনি নিজের ভরণপোষণ নিজে বহন করতে অসমর্থ হন। মামলায় আদালত এই যুক্তি প্রদান করেন যে, যেক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের ভরণপোষণ করতে পারে না সেই ধরণের ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এই রায়ে বলা হয় মুসলিম স্বামী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য তার ভরণপোষণের বিষয়টিও বিবেচনা করবেন এবং যদি কোনো স্বামী ইচ্ছামাফিক তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তবে ঐ স্বামী স্ত্রীকে মাতাহ[৬৭] প্রদান করবেন। জর্ডান, মিশর এবং সিরিয়ায় যথাক্রমে ১,

২ এবং ৩ বছরের ভরণপোষণ মাতাহ হিসেবে দেয়ার বিধান করে আইন প্রণয়ণ করা হয়েছে,[৬৮] অর্থাৎ অনেক মুসলিম দেশেই এ বিষয়ে আইন করা হয়েছে। আমাদের দেশের আইনেও বিষয়টি সুস্পষ্ট করে ইদ্দত পরবর্তী ভরণপোষণের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে এই পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

২.১.৬ বহুবিবাহ

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর ৫ নং ধারায় পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারগত বিষয়ে বহুবিবাহের কথা উল্লেখ না থাকলেও মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ অনুসারে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধপক্ষ সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্ত পূণর্বিবেচনার জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে।[৬৯] সুতরাং বহুবিবাহ পরোক্ষভাবে পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারগত একটি বিষয়। মুসলিম আইন অনুসারে একজন পুরুষ চারটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পারে।[৭০] কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ বহুবিবাহের ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত রক্ষাকবজের বিধান করেছে।[৭১] একজন পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইলে তাকে স্থানীয় চেয়ারম্যানের বরাবর আবেদন করতে হবে এই মর্মে যে, তার বর্তমান স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন।[৭২] এরপর চেয়ারম্যান সালিশী পরিষদ ডাকবেন, যেখানে তিনি নিজে থাকবেন এবং স্বামী ও স্ত্রীর উভয় পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা প্রতিনিধিরা থাকবেন। এই পরিষদ শুধুমাত্র তখনই অনুমতি দেবে যখন তারা সন্তুষ্ট হবেন যে বিবাহের প্রস্তাব 'প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত'[৭৩] এবং পরিষদ বিবাহে শর্ত যুক্ত করতে পারবেন।[৭৪] এই সালিশী পরিষদ স্বামীদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেবার সময় বর্তমান স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কিছু অতিরিক্ত শর্ত জুড়ে দিতে পারেন। যে সকল পুরুষ এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে তারা বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের মোহরানা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।[৭৫] বিবাহ চুক্তিতে বর-কনে তাদের বৈবাহিক অবস্থার কথা উল্লেখ করতে বাধ্য এবং ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার সেটা যাচাই করে দেখবেন। আদর্শ কাবিননামা চুক্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয় যে, পাত্রের কোন বর্তমান স্ত্রী রয়েছে কিনা, যদি থাকে তাহলে সে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য সালিশী পরিষদ থেকে যথাযথ অনুমতি নিয়েছে কিনা।[৭৬] নারীদের জন্য সালিশী পরিষদে যেয়ে তাদের স্বামীদের বহুবিবাহের দরখাস্ত প্রতিরোধ করা খুবই দু:সাধ্য, কারণ সালিশী পরিষদে খুবই কম নারীদেরকে সালিশদার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সালিশী পরিষদের সদস্য হিসেবে নারীদের নিযুক্ত করা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এতে করে নারীরা নিঃসংকোচে ও মুক্ত মনে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারবেন এবং সদস্যরাও তাদের সমস্যাগুলি বুঝবেন। তাছাড়া সালিশী পরিষদগুলির সার্বিক অনেক দুর্বলতা রয়েছে যেটা দেখার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের। বহুবিবাহের ক্ষেত্রে দূর্বল বিবাহ নিবন্ধন পদ্ধতি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য বিবাহ নিবন্ধনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এটা থাকার পরও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, এটি বহুবিবাহ প্রতিরোধে তেমন কোন কাজ করছে না। অ-নিবন্ধীকরণ বিবাহকে অবৈধ করেনা। নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি কম্পিউটারাইজড নয়, জেলাগুলোর মধ্যেও কোন সমন্বয় নেই। তাই পুরুষ ইচেছ করলে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় গিয়ে অনেকগুলি বিবাহ নিবন্ধন করতে পারেন।[৭৭] বাংলাদেশে বহুবিবাহ হচ্ছে এমন একটি সোপান যেখান থেকে মোহরানা, ভরনপোষন, বিবাহবিচ্ছেদ ও দাম্পত্য সম্পর্ক সম্পর্কিত সমুদয় বিরোধ তৈরী হয়, ফলে পারিবারিক আদালতে মামলার চাপ বাড়ে। একারনে বহুবিবাহ শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এ বাপারে মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১ কে পরিবর্ধন করে সালিশী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বাড়িয়ে যদি সালিশী পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় তবে বহুবিবাহ অনেকাংশে কমে আসবে। কোরআনে

উল্লেখিত স্ত্রীদের প্রতি অসম আচরণের[৭৮] সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিয়ে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে। তুরস্ক ও মরোক্ক দুইটি ক্ষেত্রে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে।[৭৯] মরোক্কান পারিবারিক বিধি (মুদাওয়ানা), ২০০৪ এর ৪০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে স্ত্রীদের প্রতি অসম আচরণের ভয় রয়েছে সেখানে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। যেখানে বিবাহের চুক্তিতে স্ত্রীর শর্ত রয়েছে যে স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবেনা সেখানেও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। অনুচ্ছেদ ৪০ ও ৪১ এ বলা হয়েছে যেখানে বিবাহের চুক্তিতে স্ত্রী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে কোন শর্ত স্থাপন করেনি সেখানে স্বামীকে আদালতের নিকট অনুমোদনের জন্য 'ব্যতিক্রমী ও বাস্তবসম্মত কারণ দর্শিয়ে' তার চূড়ান্ত বক্তব্য সহকারে আবেদন করতে হবে। তিউনিশিয়ার পারিবারিক আইন, ১৯৫৬ এর অনুচ্ছেদ ১৮ অনুসারে তিউনিশিয়া বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং এই আইন অনুযায়ী যে ব্যক্তি একজন স্ত্রীর বর্তমানে পুনরায় বিবাহ করবে তার এক বছরের কারাদণ্ড হবে বা ২৪০ তিউনিশিয়ান দিনার বা ১৪৯ ইউএস ডলার জরিমানা দিতে হবে অথবা দুটো শাস্তিই একসাথে ভোগ করতে হবে।[৮০] বাংলাদেশেও পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে এমন বিধান সংযুক্ত করে বহুবিবাহকে শর্ত সাপেক্ষে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

২.২ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের আইনগত দূর্বলতা

বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ পাশ করা হলেও অধ্যাদেশটির নিজস্ব কিছু আইনগত ত্রুটি বা দূর্বলতা থাকার কারনে এটি কাংখিত লক্ষ্য অর্জন করতে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর ধারা ৪ অনুসারে সকল প্রকার সহকারী জজ আদালত পারিবারিক আদালত বলে পরিগণিত হবে অর্থাৎ পারিবারিক আদালত কোন স্বতন্ত্র আদালত নয়। মামলা নিষ্পত্তির যে কাঠামো পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে রয়েছে, বিনা ব্যতিক্রমে তা অনুসরণ করা হলে একটি পারিবারিক মামলা ১৩৯ কার্যদিবসের মধ্যেই নিষ্পত্তি হতে পারে, যা অধ্যাদেশে উল্লেখিত ছয় মাসেরও কম। কিন্তু ১৯৮৫ সালে অধ্যাদেশ জারির পর কোনো স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়নি; বরং সব সহকারী জজ আদালতকে পারিবারিক আদালত ঘোষণা করা হয়েছে। একই আদালত একই বিচারক দুটি ভিন্ন ভিন্ন অভিধায় দেওয়ানি ও পারিবারিক মামলার বিচার করার ফলে মামলাজট ও বিলম্বের কারনে মামলা পরিচালনার খরচ বাড়ছে।[৮১] সাধারণত সহকারী জজগণ দেওয়ানি মোকদ্দমা নিয়ে অতিরিক্ত চাপ ও জটিলতার মধ্যে থাকেন। তাঁদের ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পারিবারিক আদালতের বিচারের ভার থাকলে তাঁরা স্বভাবতই এ বিষয়ে বেশি মনোযোগী হতে পারেন না। বাংলাদেশে জজ আদালতে পৃথক কোন পারিবারিক আদালত (Separate Family Court) ব্যবস্থা না থাকায় সমন জারীতে বিলম্ব, Judgment প্রদানে বিলম্ব এবং ডিক্রি জারীক্রমে টাকা আদায়ে ওয়ারেন্ট ইস্যুতে বিলম্ব, মামলার সহিমুহুরী নকল তুলতে বিলম্ব, সর্বোপরি মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়।[৮২] পৃথক পারিবারিক আদালত ব্যবস্থা চালু না থাকায় জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মামলার চাপ এবং নিম্ন আদালতে দেওয়ানী মামলার চাপ বাড়ছে। ফলে পারিবারিক মামলা দীর্ঘসূত্রিতায় আবর্তিত হয় এবং একারণে বাদি অনেক সময় মামলা চালানোর ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।[৮৩] দেওয়ানি ও পারিবারিক মামলা একই এজলাসে একই কর্মচারীদের সহায়তায় পরিচালিত হওয়ায় পারিবারিক আদালতের বিশেষায়িত ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

মধ্যস্থতা বা আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্প খরচে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করবার লক্ষ্যে পারিবারিক আদালতে বিচারকের নেতৃত্বে সরকারীভাবে Mediation ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।[৮৪] এক্ষেত্রে অসংখ্য দেওয়ানী মামলার চাপ নিয়ে পারিবারিক মামলায় Mediator হিসেবে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা বিচারকের পক্ষে অনেকটাই অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। বিচারক শুধুমাত্র পারিবারিক মামলা নিষ্পত্তি করার

দায়িত্বে থাকলে মামলার বিচার কিংবা Mediation দুটোই তার জন্য সহজ হতো। এছাড়াও অধ্যাদেশ অনুসারে বিচারককে দুইবার[৮৫] মীমাংসার উদ্যোগ নিতে হয় কিন্তু উদ্যোগ ব্যর্থ হলে যে পক্ষের কারনে উদ্যোগ ব্যর্থ হলো সে পক্ষের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে সে সম্পর্কে আইনে কিছুই বলা হয়নি। শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বিচারক পূনরায় আইনী বিচার প্রক্রিয়ায় ফিরে যাবেন। যেহেতু এই প্রয়াসে বিচারকের কোনো ক্রেডিট পয়েন্ট নাই, শুধু সময়ক্ষেপন হয় একারনে অনেক বিচারক Mediation এ আগ্রহী হননা।[৮৬] বাংলাদেশের হাইকোর্ট বিভাগ কিছু বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অধস্তন বিভাগের উপর কতগুলো শর্ত জারি করেছেন যাতে তাদেরকে পর্যাপ্ত সংখ্যক পয়েন্ট পাওয়ার জন্য প্রতিমাসে সীমিত সংখ্যক রায় অবশ্যই প্রদান করতে হয়।[৮৭] কিন্তু পারিবারিক আদালতের বিচারকগন পারিবারিক মামলায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে তেমন মনোনিবেশ করছেন না কারণ সেগুলো নিষ্পত্তিতে কোনো পয়েন্ট নেই।[৮৮] তদতিরিক্ত কিছু পারিবারিক মামলা আছে যেগুলো খুবই ঝামেলাপূর্ণ কিন্তু নিষ্পত্তির পয়েন্ট অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো সাধারণ মোকদ্দমার মতই একই পয়েন্টের। তাই একজন বিচারকের কাছে সহজ মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি করে মাসিক পয়েন্টের কোটা পূরণ করাই অধিকতর নিরাপদ এবং ফলস্বরূপ পারিবারিক মোকদ্দমার স্তুপ দিনে দিনে স্ফীত থাকছে। আইনে সংশোধনী এনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে পারিবারিক মামলার নিষ্পত্তিতে যদি পয়েন্ট আরোপ করা হতো তাহলে বিচারকগন এই পদ্ধতি অনুসরনে আগ্রহী হয়ে উঠতেন।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৬ নং ধারায় আরজি ও আরজি জবাব দাখিলের জন্য সুনির্দিষ্ট ছক তৈরীর বিধান নেই। মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যগুলো শুরুতেই আলাদা করে ফেলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ছকে বাদীকে আরজি ও বিবাদীকে আরজি জবাব দাখিলের জন্য পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৬ নং ধারায় বিধান সংযুক্ত করা প্রয়োজন। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৮ নং ধারায় বিবাদীর পেশা বা মাসিক আয় লিপিবদ্ধ করার বিধান উল্লেখ না থাকায় বিচারক বিবাদীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন না। বিধায় যখন মোহরানা, ভরনপোষন কিংবা অন্য কোন আর্থিক জরিমানা নির্ণয় করে বিচারক কর্তৃক আদেশ দেয়ার পরবর্তিতে দেখা যায় যে বিবাদীর সেই আর্থিক সামর্থ নেই। একারনে অধ্যাদেশের ৮ নং ধারায় বিবাদীর পেশা বা মাসিক আয় লিপিবদ্ধ করার বিধান সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। অনেক সময় বিভিন্ন কারনে বিবাদী বা সাক্ষীদের নিকট সমন পৌছায়না এবং একারনে মামলায় বারবার তারিখ পড়ে। Mediation এর জন্য অনেকসময় বাদীর সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৬(৪)নং ধারায় আরজিতে যেসকল তথ্য প্রদানের কথা বলা হয়েছে সেখানে বাদী, বিবাদীর ও সাক্ষীদের মোবাইল নম্বর অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়নি। একারনে মামলা করার সময় বাদী, বিবাদীর ও সাক্ষীদের মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করা সংক্রান্ত বিধান অধ্যাদেশের ৬(৪) নং ধারায় সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। অধ্যাদেশের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য আবশ্যক কোন ব্যক্তি প্রতিনিধির মাধ্যমে আদালতে হাজিরা দিতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে আমমোক্তারনামা (পাওয়ার অব এটর্নি) প্রযোজ্য হবেনা। বিধানটিতে সংশোধনী আনা দরকার কারন মামলার কোন একটি পক্ষ বা পক্ষভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ কেউ অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোন সাক্ষী যদি বিদেশে থাকেন বা বিদেশ চলে যান তবে তিনি না ফেরা পর্যন্ত মামলাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী হয়ে যায়। এরুপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির মাধ্যমে আদালতে হাজিরার সুযোগ থাকলে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হতো। সব আদালতে একই প্রক্রিয়ায় বিচারকার্য সম্পাদন করার লক্ষ্যে পারিবারিক মামলার ডিক্রি জারির বিষয়ে নির্দেশনা আরও বিস্তারিত করা দরকার অর্থাৎ ডিক্রি জারি কি সম্পূর্ণ আলাদা প্রক্রিয়ায় হবে, না মূল মামলাতেই এর কার্যক্রম চলবে তা উল্লেখ করার পাশাপাশি লেভি ওয়ারেন্ট ইস্যুসহ বিষয়গুলো আইনে সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে সংশোধনী আনা দরকার।

২.২.১পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে আইনের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সকল নাগরিক সমান এবং সমানভাবে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী হলেও পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ১(২) ধারায় বলা হয়েছে যে পার্বত্য অঞ্চলের জেলাগুলো ব্যতীত এই অধ্যাদেশ সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষগুলোকে এই আইনের সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। একারনে পার্বত্য তিন জেলায় পারিবারিক আদালত স্থাপনের জন্য পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ১(২) ধারার সংশোধন প্রয়োজন।

২.৩ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের বিধানগত বিভ্রান্তি

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে অনেক আইনগত বিষয়ে অস্পষ্টতা আছে, যা মামলার পক্ষ থেকে শুরু করে বিচারক পর্যন্ত সবাইকে বিভ্রান্ত করে। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আইনে প্রদান করা না হলে বিচারিক কার্যক্রমে তা বিভিন্ন রকম জটিলতা তৈরী করবে। নিম্নে প্রধান আইনগত অস্পষ্টতা বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

২.৩.১ ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৩ নং ধারানুসারে অন্য সব আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, অধ্যাদেশের বিধানসমূহ ৫টি বিষয়[৮৯] সম্পর্কিত মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১০০ ও ৪৮৮ নং ধারা এখনো কার্যকর থাকার ফলে সন্তানের জিম্মা দাবী করা, দেনমোহর এবং স্ত্রীদের ভরণপোষণের ব্যাপারে দুইটি অপশন রয়েছে অর্থাৎ, সন্তানের জিম্মা, দেনমোহর ও ভরণপোষণের জন্য কেউ ফৌজদারি কার্যবিধির ১০০ ও ৪৮৮ নং ধারার অধীনে মামলা দায়ের করতে পারবেন, আবার একই কারণে পারিবারিক আদালতেও মামলা দায়ের করতে পারবেন। ১৯৯০ এর গোড়ার দিকে আব্দুল খালেক বনাম সেলিনা বেগম মামলায়[৯০] হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ ঘোষণা দেয় যে,

> 'পারিবারিক সম্যস্যাগুলো নিষ্পত্তিকল্পে পারিবারিক আদালত গঠন করার পরেও যদি ম্যাজিস্ট্রেটগণ ভরণপোষণের মামলাসমূহ পরিচালনা করেন, তবে বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা দেখা দিবে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ধারাসমূহ ম্যাজিস্ট্রেটের ভরণপোষণ মামলা চালানোর ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে যা এখন পারিবারিক আদালতের বিষয়বস্তু।'

কিন্তু ১৯৯৪ সালে মেহের নিগার বনাম মুজিবুর রহমান মামলায়[৯১] আরেকটি বেঞ্চ সম্পূর্ণ বিপরীত মত দেয় যে ফৌজদারি আদালত ৪৮৮ নং ধারার অধীনে ভরণপোষণের মামলাও পরিচালনা করতে পারবে এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৮ ধারার অধীনে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনায় কোন বাধা সৃষ্টি করেনি, বিধায় এই দুই পদ্ধতির মধ্যে যেকোনো একটা কেউ বেছে নিতে পারবে। একইভাবে, ১৯৯৬ সালে রেজাউল করিম বনাম রাশিদা বেগম মামলার রায়ে বলা হয় যে আইন প্রদত্ত প্রতিকার কেড়ে নেওয়া যায় না তাছাড়া পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ঘোষণার মাধ্যমে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৮ নং ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়নি। এইরকম পরস্পর বিরোধী রায়ের পর দ্বিধাদ্বন্দ স্বাভাবিকভাবেই আরো বেড়ে যায়। কিন্তু এই দ্বিধাগুলো আর খুব বেশিদিন থাকেনি কারণ ৩ বিচারকের একটি বিশেষ উচ্চ আদালত বেঞ্চ এই বিষয়টি পচন রিক্সি দাস বনাম খুকু রাণী দাস মামলায়[৯২] সমাপ্ত করে দেন। আদালত রায়ে বলেন সন্তানের জিম্মা, দেনমোহর ও ভরণপোষণ সম্পর্কিত যত মামলা রয়েছে সবগুলোই পরিচালনা এবং সমাধান করার স্বতন্ত্র অধিকার থাকবে পারিবারিক আদালতের এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অন্যান্য আদালতের অধ্যাদেশের ধারা ৫ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার ক্ষমতা পরিষ্কারভাবেই কেড়ে নিয়েছে। আদালত রায়ে আরো বলেন,

"এই বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে ধারা ৪৮৮ এর অধীনে মামলাগুলো কিছুটা দেওয়ানী, কিছুটা ফৌজদারী এবং এই ধারা ম্যাজিস্ট্রেটদের কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছে স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য ভরণপোষণ মঞ্জুর করতে যারা নিজেদের ভরণপোষণে অক্ষম। এই ধারার উপধারা ১ হলো কিছুটা দেওয়ানী প্রকৃতির যেহেতু ভরণপোষণের আদেশ এই অংশতেই অনুমোদিত হয়েছে। কাজেই, এক কথায় বলা যায় যে ধারা ৪৮৮ আধা ফৌজদারি এবং আধা-দেওয়ানী উভয় প্রকৃতিরই। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ধারা ৩, ৪, ৫ ও ২৭ অনুযায়ী, আমরা বলতে পারি যে ম্যাজিস্ট্রেটদের এখতিয়ার সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার পূর্বে ভরণপোষণ সংক্রান্ত ব্যাপার গুলো ধারা ৪৮৮ এর অধীনে মাজিস্ট্রেটদের দ্বারাই নিষ্পত্তি হতো। এখন ২৭ ধারায় বলা আছে যে, ধারা ৫ এ বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে যেকোনো মামলা, আপীল বা আইনগত প্রক্রিয়া যা এই অধ্যাদেশের পূর্বেই অন্য কোন কোর্টে চলমান রয়েছে, তা সেই আদালতেই চলবে, শুনানী হবে এবং সেই আদালতই এর রায় প্রদান করবেন যেন এই অধ্যাদেশ জারীই হয়নি। এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পর ভরণপোষণ প্রদানে ফৌজদারী আদালতের এখতিয়ার রদ হয়ে গেছে শুধুমাত্র চলমান মামলা- প্রক্রিয়াগুলো ছাড়া।"

উপরোক্ত বিষয়ে দেশের উচ্চতর আদালতের দ্বিধাবিভক্ত রায় থাকা স্বত্বেও এখন পর্যন্ত বিষয়টি পরিষ্কার করে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে কোন বিধান সংযোজন করা হয়নি।

২.৩.২ দেওয়ানী কার্যবিধির প্রয়োগ ও বিভ্রান্তি

সাধারণত দেওয়ানী এখতিয়ার সম্পন্ন একটি আদালত দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এ বর্ণিত পদ্ধতিগুলোই মেনে চলে। কিন্তু পারিবারিক আদালত এইক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম কারণ এটি দেওয়ানী এখতিয়ারসম্পন্ন হলেও সেই সম্পর্কিত বিধি-বিধান মেনে চলে না। পারিবারিক আদালত হলো পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামক বিশেষ আইনটির অধীনে নির্দিষ্ট এখতিয়ার এবং উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত বিশেষ আদালত। দেওয়ানী কার্যবিধি পারিবারিক আদালতে কীভাবে এবং কতটুকু প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ সালের ধারা ২০(১) এ স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, পারিবারিক আদালতের কার্যক্রমে ধারা ১০ ও ১১ ছাড়া অন্য কিছু প্রয়োগ হবে না, অন্যদিকে, সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মামলায় এই বিষয়ে বিকল্প মতামত দিয়েছে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ বিভিন্ন বিষয়[৯৩] সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি বর্ণনা দিয়েছে কিন্তু দেওয়ানী কার্যবিধিতে দেওয়ানী আদালতে চলমান কোনো অভিযোগ সংশোধনের যে বিধি আছে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ তেমন কোনো বিধান প্রবর্তন করেনি। ফলে পারিবারিক মামলায় Pleadings (আরজি, জবাব) সংশোধনের ক্ষেত্রে বিধানের অভাব পারিবারিক আদালতের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করছে। এ কথাও সত্য যে একজন ভালো আইনজীবীর পক্ষেও প্রায় ক্ষেত্রেই একটি ভাল আরজি একবারেই তৈরি করা সম্ভব হয় না। উপরোক্ত মামলা উপস্থাপনের পর অন্যান্য যুক্তিসংগত কারণে আরজি সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ Pleadings (আরজি, জবাব) সংশোধন করা যাবেনা বলেও কোনো নির্দেশনা দেয়নি। এমতাবস্থায় এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারিবারিক আদালতের বিধান একটি দ্বিধাযুক্ত বিধান। আজাদ আলম বনাম জয়নব খাতুন মামলায়[৯৪] মাননীয় বিচারপতি বলেন 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের অধীনে কোন আরজি সংশোধন করা যাবেনা', কিন্তু নজরুল ইসলাম মজুমদার বনাম তাহমিনা আখতার মামলায়[৯৫] সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের অধীনে কোন মামলার আরজি সংশোধন যদি মামলাটির প্রকৃতি ও চরিত্র পরিবর্তন না করে তবে আরজি সংশোধনের অনুমতি দেয়া যাবে। ইউনুস মিয়া বনাম আবিদা সুলতানা ছন্দা মামলাতেও[৯৬] সিদ্ধান্ত হয় যে যেক্ষেত্রে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের মধ্যেই বিকল্প সমাধান আছে সেক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান প্রয়োগ করা যাবেনা। উপরোক্ত রায়ের আলোকে

বলা যায় যে যেহেতু পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে মামলা সংশোধনীর জন্য বিকল্প কোন বিধান নেই, এই বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির যে বিধান আছে তা পারিবারিক আদালতেও প্রযোজ্য হবে। অধ্যাদেশে সংশোধনী এনে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা দরকার।

যদি কোন মামলায় বাদী বা বিবাদীর সমস্যার কারণে কমিশনে জবানবন্দী গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২৬ আদেশের ৪ নং বিধি মতে কোনো পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ নেই। কেননা পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে এমন বিধান নেই যে এ জাতীয় পরিস্থিতিতে কোন পক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান গ্রহণ করতে পারে। আবার পারিবারিক আদালতের বিচার কার্যক্রমে দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ১৯০৮ এর বহু বিধান প্রয়োজন হয়। পারিবারিক মামলা অনেকটাই দেওয়ানী প্রকৃতির হওয়ার কারনে দেওয়ানী কার্যবিধি আইন ১৯০৮ এ গ্রহণকৃত সমন জারি সংক্রান্ত সংশোধনীগুলো পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী নতুবা ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্থ হবে। দেওয়ানি কার্যবিধিতে বিনা তদবিরে খারিজের অথবা একতরফা সূত্রে ডিক্রির আদেশ সরাসরি রদ করার বিধান আছে কিন্তু পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে তা নেই। দেওয়ানী কার্যবিধির বিধি ৯(ক), বিধি ১৩(ক) তে একতরফাসূত্রে মামলা নিস্পত্তি করার যে বিধান আছে তা এখন পর্যন্ত পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে সংযুক্ত করা হয়নি। ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরনে পারিবারিক আদালতের ভবিষ্যতব্য জটিলতা ও বিধানগত ঘাটতি দূর করার জন্য পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ২০ নং ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তালাক ই তাফিউয ক্ষমতাবলে একজন স্ত্রী আদালত কার্যক্রমের বাহিরে তার স্বামীকে তালাক দিতে পারে। এমন তালাকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় দেখা যায় স্বামী তালাক না মেনে স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মামলা করে এবং ঐ মামলায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দাবী করে যেন স্ত্রী অন্য কোথাও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে না পারে। এই অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর দেওয়ানী কার্যবিধির একটি বিধান। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় পারিবারিক আদালতের বিচার কার্যক্রমে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার মামলায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করা যাবেনা। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকার কারনে তাহলে কি তালাকনামা প্রেরনের ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে? পরবর্তিতে যদি দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মামলার রায় আদালত স্বামীর পক্ষে দেন? মকবুল মাজেদ বনাম সুফিয়া খাতুন মামলা[৯৭] হতে জানা যায়, ১৯৮৫ সালে লক্ষীপুরের রামগঞ্জের সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা হয়। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের অধীনে করা সর্বপ্রথম মামলাটিতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। এতে স্বামী তাঁর স্ত্রীর দ্বিতীয় বিয়ের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করে। আদালত নিষেধাজ্ঞার আবেদন অগ্রাহ্য করেন। পরে জেলা জজ আদালতে আপিল করা হলে আপিল নামঞ্জুর হয়। পরে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন করা হয়। হাইকোর্ট বিভাগ এই মামলায় 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে ২০ ধারা অনুযায়ী দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা প্রয়োগযোগ্য নয় বলে রায় দেন।।[৯৮] আইনে সুস্পষ্ট বিধান আছে বলেই হাইকোর্ট বিভাগ এমন আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাদেশে যদি দেওয়ানি কার্যবিধির বিধান প্রয়োগ করা যাবে মর্মে বিধান থাকতো তাহলে হয়তো হাইকোর্ট বিভাগ পর্যন্ত মামলাটি নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতোনা।

২.৩.৩ ধর্মনিরপেক্ষ পারিবারিক আদালত

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার পর থেকে যে বিভ্রান্তি রয়েছে তা হলো পারিবারিক আদালত শুধু মুসলমানদের জন্য গঠিত একটি আদালত কিনা। এই বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আইনটির ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর

বিধান সাপেক্ষে পারিবারিক আদালতের কতিপয় বিষয়[৯৯] বিচার করার এখতিয়ার থাকবে। আইনের এই বিভ্রান্তি পরে অবশ্য আদালতের কয়েকটি যুগান্তকারী রায়ের মধ্য দিয়ে নিরসন হয়েছে। অথচ এখন পর্যন্ত পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। ফলে সাধারণ জনগন যাদের সুবিধার জন্য আদালত গঠন করা হয়েছে তারা এখনও পারিবারিক আদালতের বড় অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত নন। প্রথম বিতর্কের সূত্রপাত হয় কৃষ্ণপদ তালুকদার বনাম গীতশ্রী তালুকদার নামক মামলায়।[১০০] প্রশ্ন উঠে একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে ভরণপোষণের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারবে কিনা। হাইকোর্ট ডিভিশনের বিজ্ঞ বিচারক এই মামলায় ১৯৯৪ সালের ৫ই জুন বলেন যে, অধ্যাদেশের ২৭টি ধারাই শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। ১৯৯৪ সালের ২৫ই জুলাই নির্মল কান্তি দাস বনাম শ্রীমতী বিভারাণী মামলায়[১০১] হাইকোর্ট বিভাগ সম্পূর্ণভাবে বিপরীত মতামত ব্যক্ত করেন। মামলার বিচারক পারিবারিক অধ্যাদেশের ৩ নং ধারার বিধান, "বর্তমানে বলবৎ অপর কোন আইনে যাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহ বলবৎ হবে" উল্লেখ করে বলেন যে, পারিবারিক আদালতের বিধান প্রযোজ্য হবে। 'অন্য আইন' এই অভিব্যক্তি থেকে এটা বোঝায় যে, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর বিপরীত কিছুনা। একইভাবে যেকোন ব্যক্তি যে বিশ্বাসের হোকনা কেন তার অধিকার আছে বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, ভরণপোষণ, শিশুর অভিভাবকত্ব এবং হেফাজত বিষয়ে কোন বিরোধ মীমাংসার জন্য পারিবারিক আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করার। সুতরাং একজন হিন্দু মহিলা ভরণপোষণের জন্য তার স্বামীর বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। মেহের নিগার বনাম মো. মজিবুর রহমান মামলায়ও[১০২] আদালত একই রায় প্রদান করেন। তবে দেখা যাচ্ছে, আদালতগুলো কিন্তু এ বিষয়ে একমত হতে পারেনি। ১৯৯৭ সালে পচন ঋষি দাস বনাম খুকু রানী দাস এবং অন্যান্য মামলার[১০৩] রায়ে আদালত যে মতামত প্রকাশ করেন, তার ফলে আর কোনো দ্বিধার অবকাশ থাকার কথা নয়। এ মামলার রায় একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। রায়ে আদালত বলেন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ বাংলাদেশে বসবাসকারী সব ধর্মের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। রায়ের পক্ষে আদালত যে যুক্তিগুলো পেশ করে, সেগুলো হলো-

> 'প্রথমত, যে কোনো আইন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা খুঁজে বের করা একটি বড় ব্যাপার। যেমন, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ যে কেবল মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য, তা কিন্তু আইনের নাম দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য যদি পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর প্রণেতাদের প্রভাবিত করত, তাহলে আইনের নামেও তার প্রতিফলন থাকাটা যুক্তিসঙ্গত ছিল। ফলে আইনটির নাম হওয়া উচিত ছিল মুসলিম পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫। দ্বিতীয়ত, আইনের কোথাও কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বাদ দেয়া হয়নি। যেমন বলা হয়নি, হিন্দু অথবা খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী এই আইনের আওতায় আসবে না। আবার কোথাও কিন্তু এটাও বলা হয়নি, আইনটি কেবল মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না বলা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু কোনো সমপ্রদায়কেই বাদ দেয়া উচিত নয়।'[১০৪]

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ তো পার্বত্য এলাকাগুলোতে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং ঐ এলাকাগুলোতে বাস করা মুসলমান ধর্মের একজন লোকও কিন্তু আইনের অধীনে আসতে পারবে না। সুতরাং কখনও এটা বলা সঙ্গত হবে না যে, আইনটি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য।[১০৫] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সব ধরনের ভিন্নমত দূর করার জন্য আইনটির বিধানগুলো আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত। অধ্যাদেশটিতে এখতিয়ারের জায়গায় এটা বলে দেয়া উচিত যে, আইনটির অধীনে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার সকল ধর্মের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

২.৪ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের অসম্পূর্নতা

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে মাত্র ৫ বিষয়ের বাইরে পারিবারিক জীবনের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে কোন বিধান নেই। পারিবারিক জীবনের অনেক বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে যা পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারের আওতায় নিয়ে আসা জরুরী। নিম্নে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের অসম্পূর্নতা বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

২.৪.১ বিবাহ সম্পর্কিত বিরোধ

পারিবারিক আদালতকে যে বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তা মূলতঃ বিবাহ থেকেই আগত। অর্থাৎ পারিবারিক আদালতের সমস্ত বিষয়বস্তুই অকার্যকর হবে যদি বিবাহটিই প্রমাণ করা না যায়। উদাহরনস্বরুপ বলা যায় ভরণপোষন বা সন্তানের অভিভাবকত্বের মামলা ব্যর্থ হবে যদি বিবাহটি অবৈধ প্রমানিত হয়। বিবাহের বৈধতা নিরুপন পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারের আওতাধীন না হওয়ায় বিষয়টি দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি করতে হয় যা হতাশাজনক ও সময়সাপেক্ষ একটি ব্যাপার। অধিকাংশ পারিবারিক মামলায় আদালতের নিকট থেকে পক্ষগনের 'declaration of marriage', 'declaration of marital status', বা 'declaration of marriage status' নেয়ার প্রয়োজন পড়ে যা মূল মামলাটিকে টিকিয়ে রাখে এবং পারিবারিক আদালতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে। বিষয়গুলো পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৫ নং ধারার আওতাভূক্ত না হওয়ায় পক্ষগনকে দেওয়ানী আদালতের শরণাপন্ন হতে হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম মূলতবি রাখতে হয়, যা পক্ষগনকে নানা রকম হয়রানীর মধ্যে ফেলে। একারনে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৫ নং ধারায় 'validity of marriage' এবং 'legitimacy of children' বিষয় দুইটি অন্তর্ভূক্ত করে পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সন্তানের বৈধতা নিরুপণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধানকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। কারন সন্তানের বৈধতার অনুমান সংক্রান্ত বাংলাদেশের সাক্ষ্য আইনের ১১২ নং ধারা[১০৬] অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই ধারা একদিকে যেমন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে আগত সন্তানকে বিবাহ পরবর্তি সময়ে জন্মলাভ করায় বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, অন্যদিকে বিবাহ বিচ্ছেদের ২৮০ দিন পর সন্তান জন্মলাভ করলে তাকে অবৈধ বলেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বলা হয়েছে অবৈধ সম্পর্ক থেকে আগত কোনো সন্তানকে বৈধ ঘোষনার সুযোগ নাই কারন এটি প্রকান্তরে স্বামী স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ককে বৈধ সম্পর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যদিকে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে বিবাহ বিচ্ছেদের ২৮০ দিন পর সন্তান জন্মলাভ করলেও যৌক্তিক কারনে অনেক আদালত তাকে বৈধ সন্তান বলে রায় দিয়েছে।[১০৭] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৫ নং ধারার মাধ্যমে তালাক পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও 'judicial divorce' ও 'judicial separation' তালাক সম্পর্কিত বিষয় কিনা অধ্যাদেশে সে সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। পাশাপাশি পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ২৩ নং ধারানুসারে পারিবারিক আদালত বিবাহভঙ্গের রায় প্রদান করার পর সালিশী পরিষদের নিকট রায়ের প্রতিলিপি ৭ দিনের মধ্যে পাঠাবেন এই লক্ষ্যে যে যেন অধ্যাদেশের অধীন চেয়ারম্যান আবশ্যক তালাকের অবগতি লাভ করেন। আবার একই ধারায় বলা হয়েছে চেয়ারম্যান উক্ত প্রতিলিপি পাওয়ার পরে ৯০ দিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর তালাক সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন এবং যদি সফল হন তবে আদালতের রায় অকার্যকর হবে। বিষয়টি অস্পষ্ট ও জটিলতাপূর্ণ। এক্ষেত্রে আদালতের রায় চূড়ান্ত কিনা, আদালতে রায় পাবার পরেও মেয়েটিকে কেন সালিশী পরিষদের মুখোমুখি হয়ে মানষিক চাপ মোকাবেলা করতে হবে, আদালতে মেয়েটির সময়ক্ষেপন কেনো করা হলো, সালিশী

পরিষদ যদি মীমাংসায় সফল হয় তবে আদালতের রায় কিভাবে বাতিল হবে, রায়ের প্রতিলিপি যদি ৭ দিনের মধ্যে না পৌছায় তার ফল কি হবে, ইদ্দতকাল কবে থেকে গননা শুরু করতে হবে প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ধারাটিতে সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন।

২.৪.২ পিতামাতার ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিরোধ

বাংলাদেশে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনকারী পিতামাতা বৃদ্ধ বয়সে যাতে সন্তান কর্তৃক অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার না হন সে জন্য পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ কার্যকর রয়েছে।[১০৮] এই আইনের মূল লক্ষ্য হলো পিতা-মাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীর ভরণপোষণ নিশ্চিত করা। যা মূলত দেওয়ানি প্রকৃতির এবং পারিবারিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত। একারনে পিতা-মাতার ভরণপোষণের বিষয়টি পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা প্রয়োজন। পিতা-মাতা ভরণপোষণের বিষয়টি পারিবারিক আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া অধিক বাঞ্চ্ছণীয়। কারণ আমাদের দেশে প্রচলিত ভরণপোষণের বিধি-বিধান সমূহ অর্থাৎ স্ত্রী কিংবা সন্তানের ভরণ-পোষণ পারিবারিক আদালতসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়। পারিবারিক আদালতের সার্বিক পরিবেশ, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের চাইতে পিতা-মাতার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক অনুকূল। সেইদিক বিবেচনা করে পিতা-মাতার ভরণপোষণ আদায় পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হওয়া যুক্তিসংগত। যদি কোনো সক্ষম ও সামর্থবান সন্তান, পিতা-মাতার ভরণপোষন না দেয়, বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বৃদ্ধনিবাস বা অন্য কোথাও আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করে বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা প্রদান না করে কিংবা তাদের সাথে নিয়মিতভাবে দেখা সাক্ষাৎ না করে, সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পিতা অথবা মাতা প্রথম শ্রেনির জুডিসিয়াল বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ করতে পারে।[১০৯] এ আইনের ৫ ধারা মোতাবেক পিতামাতার ভরণপোষণ না করলে অনূর্ধ্ব এক লাখ টাকার জরিমানা এবং অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। আইনটি শুধু পিতামাতার ভরণপোষণ বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পিতামাতার অবর্তমানে দাদা-দাদী ও নানা-নানীর ভরণপোষণের বিষয়েও জোর দিয়েছে। পিতার অবর্তমানে দাদা-দাদীকে এবং মাতার অবর্তমানে নানা-নানীকে পিতামাতার মতো ভরণপোষণ দিতে হয়।[১১০] আইনে দাদা-দাদী বা নানা-নানী কোন পদ্ধতি অনুসরন করে তাদের অভিযোগ জানাবেন, সে সম্পর্কিত কোনো বিধান নেই। অর্থাৎ তাদের প্রতিকার প্রার্থণার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। যেক্ষেত্রে সন্তান আর্থিকভাবে পিতা-মাতার ভরণ পোষণ প্রদানে অক্ষম, সেক্ষেত্রে তাদের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব কে নেবে তা আইনে নেই। ফলে পিতা-মাতার অধিকার রক্ষায় আইনটির প্রয়োগে সমস্যা সৃষ্টির অবকাশ থেকেই যায়। তাছাড়া এই আইনে সরাসরি প্রতিপক্ষকে শাস্তি প্রদানের বিধান করা হয়েছে। তার আগে আদালতে পিতা-মাতাকে ভরণপোষণ প্রদানের জন্য সন্তানের প্রতি আদেশ দানের সুযোগ রাখা হয়নি। আইনানুযায়ী আমলী আদালতে কেবল সংক্ষুব্ধ পিতা-মাতাই অভিযোগ করতে পারবে।[১১১] পিতামাতার অবর্তমানে বা তারা অসুস্থ থাকলে বা চলাফেরার জন্য অক্ষম হলে কে লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে সে বিষয়ে আইনে কিছুই বলা হয়নি। আদালত প্রয়োজন মনে করলে এই আইনের আওতায় প্রাপ্ত কোনো অভিযোগ আপোষ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মেয়র বা অন্য যেকোনো উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করতে পারবে। ভরণ-পোষণের পরিমান এবং সময় সম্পর্কে আইনে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। কোনো সন্তান ৩ ও ৪ ধারার বিধান লংঘন করলে তাকে অর্থদন্ডে দন্ডিত করার বিধান আছে, কিন্তু কিভাবে তা পিতা-মাতা কে বন্টন করা হবে সে সম্পর্কিত কোনো বিধান আইনে নেই। তাছাড়া কোনো দন্ডপ্রাপ্ত সন্তান যদি অর্থ অনাদায়ে কারাদন্ড বরণ করে, সেক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভরণপোষন নিশ্চিত করার কোনো বিধান আইনে রাখা হয়নি। পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীকে প্রথমেই তাদের অধিকার

আদায়ার্থে আদালতে প্রেরণ না করে, কোনো ফোরামে প্রেরণ যুক্তিসংগত, যাদের মূল কাজ হবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সন্তানদের কাছ থেকে যুক্তিসংগত ভরণপোষণ প্রদানের নির্দেশ দেয়া। এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে তবে বিবেচ্য বিষয়টি আদালতে নেয়া যেতে পারে। সন্তান পিতা-মাতাকে ভরণপোষণ প্রদানে অক্ষম হলে, রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব নিতে হবে- এ বিধান মূল আইনে অর্ন্তভুক্ত করা দরকার। যেহেতু, অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানের আর্থিক অস্বচ্ছলতাই ভরণপোষণ প্রদান না করার কারণ হতে পারে, যেহেতু পুরো বিষয়টিই মানবিক এবং নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত - অপরাধের সাথে নয়, সেহেতু কারাদন্ড বাদ দেয়া যেতে পারে এবং অর্থদন্ড প্রদান করা যেতে পারে।

২.৪.৩ বিবাহত্তোর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ

সংসারে ও পরিবারের সম্পত্তিতে নারীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকার পরেও বাংলাদেশে বিবাহত্তোর সম্পত্তি পরিচালনার জন্য কোন আইন নেই। ২০১০ সালের পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন এই সীমাবদ্ধতা কিছুটা পূরণ করলেও এটা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারীদের শুধুমাত্র 'যৌথ বাসগৃহে' বসবাসের অধিকার দেয়।[১১২] পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধের এই আইন ছাড়া বাংলাদেশে বিবাহত্তোর সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার বা তালাক পরবতীতে এর বন্টন বিষয়ে কোন স্বীকৃতি, সংজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কোন দেওয়ানী বা ব্যক্তিগত আইন বা কোন বিধিমালা নেই।[১১৩] বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী নিজেরা নিজেদের মত করে সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করতে পারেন। বিবাহিত দম্পতিরা যৌথ নামে সম্পত্তি কিনতে পারেন। কোন রকম আইনী অনুমোদন ছাড়াই পারিবারিক সম্পত্তির যৌথ অংশীদার হতে পারেন। জমি ক্রয় ছাড়াও বাংলাদেশের অনেক নারী বা পুরুষ তাদের ব্যাক্তিগত আয়ের সমুদয় অর্থ সাংসারিক ও পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করার পিছনে খরচ করেন। বছরের পর বছর সংসারে শ্রম দেবার পরও বিবাহ বিচ্ছেদের কারনে অনেক নারী বৈবাহিক গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিদায়ের সময় শুধুমাত্র কিছু অলংকার আর ছোটখাটো জিনিসপত্রের বেশী কিছু তারা সঙ্গে নিতে পারেননা। বাংলাদেশের পারিবারিক আইন এগুলির কোন কিছুই বিবেচনা করেনা এবং সঙ্গতকারনে পারিবারিক আদালতও বিবেচনায় নেয়না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো এবং তুরস্ক তাদের আইন সংস্কার করেছে এবং তালাক পরবর্তী বৈবাহিক সম্পত্তি বন্টনের বিধান করেছে।[১১৪] এমনকি পাশ্ববর্তী দেশ ভারতেও পারিবারিক আদালত দম্পতিদের সম্পত্তি সম্পর্কিত বিরোধ বিধিবদ্ধ আইনের[১১৫] অধীনে নিষ্পত্তি করে থাকে। বাংলাদেশেও এমন বিধান করা দরকার এবং বিষয়টি পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারভূক্ত করা দরকার।

২.৪.৪ দত্তক সংক্রান্ত বিষয়

বাংলাদেশে দত্তক সংক্রান্ত কোনো রাষ্ট্রীয় বিধান বা আইনি কাঠামো নেই। মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধ-শিশুদের (war babies) বৈধভাবে দত্তক দেয়ার জন্য বাংলাদেশে The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) Order, ১৯৭২ নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৮২ সনে এই আইনটি বাতিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অনেক পরিত্যাক্ত শিশুকে এই আইনের অধীনে দত্তক দেয়া হয়েছিল। শিশু পাচার বা ধর্মান্তরিতকরণের আশংকায় এই আইনটি বাতিল করা হয়েছিল।[১১৬] তবে এর মাধ্যমে এটি বলা যায় রাষ্ট্রীয় আইন প্রচলনের মাধ্যমে দত্তক দেয়া বা নেয়ার উদাহরণ বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিম আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে দত্তক নেওয়ার কোন সুযোগ না থাকলেও ১৮৭৫ সালের সাবালকত্ব আইনের ধারা ৩ মোতাবেক ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুর জন্য ১৮৯০ সালের অভিভাবকত্ব ও প্রতিপাল্য আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী কাস্টডি নিতে হলে ১৯৮৫ সালের পারিবারিক

আদালত অধ্যাদেশের অধীনে এখতিয়ারভুক্ত পারিবারিক আদালতে আবেদন করা যায়। বাংলাদেশে সরকারের কোনো স্বতন্ত্র দত্তক কর্তৃপক্ষ বা দত্তক সংক্রান্ত এজেন্সি নেই। অভিভাবকত্ব আইনে অভিভাবকত্ব প্রাপ্তির বিষয়টি নিষ্পত্তি হলেও দত্তক নেয়ার কোন সুযোগ নেই। এ কারণে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নিঃসন্তান দম্পতি দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আইনের অগোচরে কিনে নেয়। অথবা দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সন্তান নিয়ে নিজের সন্তান হিসেবে লালন পালন করতে থাকে। তারপরেও আইন না থাকার কারণে এই পালিত সন্তান তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না। এমনকি পালক পিতামাতার নামও আইনত গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশে হিন্দু আইনে দত্তক নেওয়ার বিধান থাকলেও শুধু ছেলে শিশু দত্তক নেওয়া যায়।[১১৭] হিন্দু পুরুষ বিবাহিত, অবিবাহিত বা বিপত্নিক যা-ই হোক না কেন, তার দত্তক নেওয়ার অধিকার আছে। এ ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার সীমিত। একজন অবিবাহিত নারী দত্তক নিতে পারেন না। বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি দরকার। এমনকি বিধবা হিন্দু নারী দত্তক নিতে চাইলে তাকে স্বামীর মৃত্যুর আগে দেওয়া অনুমতি দেখাতে হবে। খ্রিস্টধর্মেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দত্তক নেওয়ার বিধান নেই। বাংলাদেশের খ্রিস্টানরাও শিশুর শুধু অভিভাবকত্ব নিতে পারেন। বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন কারনে নিঃসন্তান দম্পতির সংখ্যা বাড়ছে এবং একারনে নিঃসঙ্গতা কাটাতে ঐ দম্পত্তি কর্তৃক সন্তান হেফাজতে নেওয়ার বা অন্য অর্থে দত্তক নেওয়ার প্রবণতাও দিন দিন বাড়ছে।[১১৮] অভিভাবকত্ব আইনের মাধ্যমে দত্তক ব্যবস্থা কিছুটা প্রচলিত হলেও মূলতঃ এই আইনের জটিলতার কারণে মানুষ এতে উৎসাহিত হয় না।[১১৯] এমনকি নি:সন্তান দম্পতিদের সম্পত্তির অধিকার থেকে দত্তক সন্তান বঞ্চিত হচ্ছে। যেহেতু এখন দত্তক সংক্রান্ত বিষয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং পারিবারিক বিষয়, সেহেতু বিষয়টি আইনী কাঠামোর অধীনে এনে পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। বাংলাদেশ আইন কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে,[১২০]

> '---ইন্দোনেশিয়ায় মুসলিম আইনকে বিধিবদ্ধ করার সময় দত্তককে প্রচলিত আইনের আলোকে ভিন্ন রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে দত্তক সন্তানকে বাধ্যতামূলকভাবে উইলের মাধ্যমে সম্পত্তি প্রদান করা যায়। অনুরূপভাবে দত্তক পিতামাতাও দত্তক সন্তানের সম্পত্তি থেকে অংশ পায়। ২০০১ সালে তুরস্কে সিভিল কোডের মাধ্যমে কিছু শর্ত যোগ করে দত্তক প্রথার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এখানে অবিবাহিত ব্যক্তির বয়স ৩০ বছর হলে সে দত্তক নিতে পারবে। অন্যদিকে কোন দম্পত্তিকে দত্তক নিতে হলে তাদেরকে যৌথভাবে দত্তক নিতে হবে এমন বিধান করা হয়েছে। এমনকি তিউনেসিয়ায় দত্তক সন্তানকে তার দত্তক পিতার নাম গ্রহণের অধিকার পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। আলজেরিয়াতে শরীয়াহ্ মতে দত্তক নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও আর্থিকভাবে সম্পন্ন লোক চুক্তিপত্রের মাধ্যমে আদালত বা নোটারি পাবলিকের সম্মুখে হলফনামার মাধ্যমে দত্তক নিতে পারে।'

২.৫ সমস্যা নিরসনে করণীয়

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশসহ বিদ্যমান পারিবারিক আইনসমূহের নিজস্ব ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতার কারনে পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছেনা। বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ে মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ **১৯৬১** এর ৭ নং ধারায় সালিশী পরিষদের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সুনির্দিষ্ট করে একটি গাইডলাইন বা বিধি প্রণয়ন করা দরকার যাতে করে তালাকের আবেদনের সাথে দেনমোহর, ভরণপোষণ ও সন্তান থাকলে তার জিম্মা নেওয়ার বিষয়সমূহ সালিশী পরিষদের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয় এবং এতে করে পারিবারিক আদালতের উপর মামলার চাপ কমবে।

দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে আদালতে সংঘাতপুর্ণ রায় থাকায় এবং এই বিধানটি ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং সেদিক থেকে সংবিধানও লংঘন করেছে বিধায় এটি পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ থেকে বাদ দিয়ে সেখানে আপোষ-মীমাংসার প্রাক্কালে প্রয়োজন অনুসারে বিচারক তালাক সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির সময় নিজস্ব বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারকে গুরুত্ব দিতে পারেন মর্মে বিধান আইনে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

মোহরানার ক্ষেত্রে সালিশী পরিষদকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে অথবা বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সময়েই মোহরানা আদায় নিশ্চিত করা সংক্রান্ত বিধান কাবিননামায় উল্লেখ করা যেতে পারে। মোহরানা আদায় না করার জন্য বাংলাদেশে যে শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা নেহায়েত নগন্য। আইনের সংশোধন সাপেক্ষে এই শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে করে শাস্তি এড়ানোর ভয়ে স্বামীগণ স্ত্রীদের মোহরানার অধিকার নিশ্চিত করে। একটি মোহরানার মামলার ক্ষেত্রে একজন মহিলাকে আদালতে দুইটি মামলা দায়ের করতে হয়, যা নানারকম অসুবিধার তৈরী করে। অথচ একটি মামলার মাধ্যমেই এর সমাধান করা সম্ভব। ডিক্রীর ক্ষেত্রে বর্তমান বাজারে টাকার মূল্যমানের দিকে লক্ষ্য রেখে আদালতকে রায় প্রদান করতে হবে অর্থাৎ আদালত কর্তৃক টাকার মুল্যমান বৃদ্ধি করতে হবে।

ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পারিবারিক আদালতের বিচারকদের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সুর্নিদিষ্ট মানদণ্ড[১২১]সংক্রান্ত বিধান পারিবারিক আইনে সন্নিবেশিত করা এবং স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকারের সাথে তার 'আনুগত্য', 'সতীত্ব', 'বৈবাহিক কর্তব্য', অথবা 'চারিত্রিক সততা' প্রভৃতি মানদণ্ডের সম্পর্ক থেকে বিলুপ্ত করা প্রয়োজন।

বহুবিবাহের ব্যাপারে মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১ কে পরিবর্ধন করে সালিশী পরিষদের দায়িত্ত্ব ও ক্ষমতা বাড়িয়ে যদি সালিশী পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় তবে বহুবিবাহ অনেকাংশে কমে আসবে। কোরআনে উল্লেখিত স্ত্রীদের প্রতি অসম আচরণের সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিয়ে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশেও পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে এমন বিধান সংযুক্ত করে বহুবিবাহকে শর্ত সাপেক্ষে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যগুলো শুরুতেই আলাদা করে ফেলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ছকে বাদীকে আরজি ও বিবাদীকে আরজি জবাব দাখিলের জন্য পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৬ নং ধারায় বিধান সংযুক্ত করা প্রয়োজন এবং অধ্যাদেশের ৮ নং ধারায় বিবাদীর পেশা বা মাসিক আয় লিপিবদ্ধ করার বিধান সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। এতে করে প্রাপ্য খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণ সহজ হবে। ডিক্রীকৃত অর্থ জমাদান সহজীকরণের লক্ষ্যে মোবাইল এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান, ই-পেমেন্ট ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পারিবারিক আদালতে গৃহীত কোর্ট ফি বিষয়ে সার্কুলার/নির্দেশনা জারি করা প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন জেলায় এরূপ মামলায় বিভিন্ন রকম কোর্ট ফি গ্রহণ করা হয়। যোগাযোগের সুবিধার্থে মামলা করার সময় বাদী, বিবাদীর ও সাক্ষীদের মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করা সংক্রান্ত বিধান অধ্যাদেশের ৬(৪)নং ধারায় সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। পারিবারিক মামলার ডিক্রি জারির বিষয়ে নির্দেশনা আরও বিস্তারিত করা দরকার অর্থাৎ ডিক্রি জারি কি সম্পূর্ণ আলাদা প্রক্রিয়ায় হবে, না মূল মামলাতেই এর কার্যক্রম চলবে তা উল্লেখ করার পাশাপাশি লেভি ওয়ারেন্ট ইস্যুসহ এ-সংক্রান্ত বিষয়গুলো আইনে সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। লেভি ওয়ারেন্ট ফেরতের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারন করা প্রয়োজন।

মামলা সংশোধনীর জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির যে বিধান আছে তা পারিবারিক আদালতেও প্রযোজ্য হবে মর্মে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে সংশোধনী এনে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা দরকার। আপীলে আরজি-জবাব সংশোধন এবং অতিরিক্ত প্রমাণ দাখিলের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আইনে সংশোধনী আনয়ন করা প্রয়োজন। দেওয়ানি কার্যবিধির মতো এই আইনেও বিনা তদবিরে খারিজের অথবা একতরফা সূত্রে ডিক্রির আদেশ সরাসরি রদ করার বিধান সংযোজন করা প্রয়োজন। সমন জারী সংক্রান্ত যে সকল সংশোধনী দেওয়ানী কার্যবিধিতে আনয়ন করা হয়েছে সেগুলো পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

বিভ্রান্তি দূর করার জন্য পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশটিতে এখতিয়ারের জায়গায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আইনটির অধীনে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার সব ধর্মের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৫ নং ধারায় 'validity of marriage', 'legitimacy of children', 'judicial divorce' ও 'judicial separation' বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করে পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পারিবারিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত বিধায় বিবাহত্তোর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা প্রয়োজন। পিতা-মাতার ভরণপোষণের বিষয়টি পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা প্রয়োজন। সন্তান পিতা-মাতাকে ভরণপোষণ প্রদানে অক্ষম হলে, রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব নিতে হবে মর্মে বিধান মূল আইনে অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন।

পারিবারিক আপিল নিষ্পত্তির কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নাই। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান করা প্রয়োজন। পারিবারিক মামলায় সাক্ষী বা দলিল উপস্থাপন না করলে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৮(২) ধারায় জরিমানার যে বিধান রয়েছে, তা অত্যন্ত নগন্য। এটি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ প্রয়োগের জন্য উক্ত অধ্যাদেশের ১(২) ধারার সংশোধন প্রয়োজন।

২.৬ উপসংহার

আইন যদি হয় অসম্পূর্ন ও ক্রটিপূর্ণ সেই আইন দ্বারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়না। উপরন্তু ভূক্তভোগীদের ভোগান্তিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। অত্র অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ও পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারের সাথে সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আইনসমূহের অনেক ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। আইনের বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে সমস্যা থাকতেই পারে কিন্তু মূল আইনে সমস্যা থাকলে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়না। কোন আইন যদি হয় ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তবে তা বাস্তবায়নে নানারকম জটিলতা তৈরি হয় যা আইনটির উদ্দেশ্যকেই ব্যহত করে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৯ সালে সংশোধনের প্রাক্কালে আইনটিকে নিয়ে খুব বেশী গবেষনা করা হয়নি। সংশোধিত একটি আইনের এতবেশী ক্রটি ও অসম্পূর্নতা থাকা অস্বাভাবিক। এ কথাও সত্য যে এই আইনের অধীনে মামলাকারী অধিকাংশই নারী। রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণ হিসেবে নারীদেরকে অধিকার বঞ্চিত এবং অশান্তির মধ্যে রেখে জাতীয় উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। পারিবারিক বিরোধ স্বল্পসময়ে ও সহজভাবে নিষ্পত্তি করতে হলে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশসহ পারিবারিক আইনসমূহকে ক্রটিমুক্ত করতে হবে এবং অসম্পূর্নতা দূর করতে হবে।

তথ্য নির্দেশ

[১] যে বিষয়সমূহ নিয়ে পারিবারিক আদালতে বিচারকার্য পরিচালিত হয় সেই বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির এবং সেই ভিন্ন প্রকৃতির কারণে পারিবারিক আদালতের বিচার ভিন্ন অবস্থায় হতে পারে। স্বামীর সাথে স্ত্রীর, স্ত্রীর সাথে স্বামীর বা সন্তানের সাথে পিতামাতার বিরোধ অনেক সময় জনসমক্ষে প্রকাশ করা বিব্রতকর হয়ে পড়ে। এ সমস্ত কারণে আইন এই মামলা রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচারের ব্যবস্থা রেখেছে। আপোস বা পুনর্মিলনের জন্য আদালত খাস কামরায় উভয় পক্ষকে বা যেকোনো পক্ষকে ডেকে চেষ্টা করতে পারেন অথবা আদালত কোনো মহিলা সাক্ষীর সাক্ষ্য খাস কামরায় গ্রহণ করতে পারেন। আদালত নিজের ইচ্ছায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে বা খাস কামরায় বিচারানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেন না। এজন্য আদালতকে উভয় পক্ষ কর্তৃক অনুরোধ করতে হবে। পক্ষগণ আদালতের কাছে আবেদন না করলে আদালত খাস কামরায় সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন না। দেখুন, ধারা ১১, *পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ*, ১৯৮৫

[২] ধারা ২১, *পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫*

[৩] ধারা ৪, *Ibid*

[৪] ধারা ৬, *Ibid*

[৫] ধারা ৬, *Ibid*

[৬] ধারা ৭, *Ibid*

[৭] ধারা ২৫, *Ibid*

[৮] ধারা ২২, *Ibid*

[৯] ধারা ৬, *Ibid*

[১০] ধারা ১০, *Ibid*

[১১] স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামী কর্তৃকহস্তান্তর করার কারনে অথবাস্ত্রীর সম্পত্তির ওপর আইন সম্মত অধিকার প্রয়োগে স্বামী বাধা দিলে স্ত্রী যদি একারনেবিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে, তবে এই প্রকৃতির বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পারিবারিক আদালতের রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে। এছাড়াও মোহরানার টাকা ৫০০০ টাকার উর্ধ্বে না হলে সেক্ষেত্রে আদালতের রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যায়না। দেখুনঃ ধারা ১৩, *পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫*

[১২] ধারা ১৭, *Ibid*

[১৩] ধারা ৩, *Ibid*

[১৪] ধারা ৫, *Ibid*

[১৫] D F. Mulla, *Commentary on Mohammedan Law*, 2nd Ed, Published by Dwivedi Law Agency, Allahabad, 2009

[১৬] ধারা ৭, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ*, ১৯৬১

[১৭] কাবিননামার ১৮ নং ঘরে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পন করে থাকে, সে ক্ষমতার বলে স্ত্রী যদি স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চায় তাহলে সে বিচ্ছেদকে তালাক-ই-তৌফিজ বলে। তালাক-ই-তৌফিজের ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারবারিক অর্ডিন্যান্সের ৭ ধারায় বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। তালাক-ই-তৌফিজ স্ত্রীর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নয়। এটি স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা। নিকাহনামা বা কাবিননামার ১৮ নং ঘরে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছে কিনা? করে থাকলে কি শর্তে ? এই প্রশ্নটি ছাপা থাকে। স্বামীর যে তালাক দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে সে ক্ষমতাটি যদি স্বামী স্ত্রীকে কাবিননামার ১৮ নং ঘর পূরণের মাধ্যমে প্রদান করে তবে স্ত্রী নিজ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা শর্তযুক্ত বা শর্তহীন হতে পারে। স্ত্রী কর্তৃক এরূপ তালাক উচ্চারণ করা হলে বা বিয়ে ছিন্ন করা হলে সে তালাকের নাম তালাক-ই-তোফিজ। এক্ষেত্রে যেহেতু স্ত্রী তালাক দিচ্ছেন তাই তালাক সংক্রান্ত নোটিশ চেয়ারম্যানের কাছে এবং এর কপি স্বামীর কাছে পাঠাতে হবে। তালাক-ই-তোফিজ মুসলিম আইনে একটি কার্যকর সংযোজন। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কাবিননামার ১৮ নং ঘরটি ফাকা থাকে। ফলে ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে যে ৯টি কারণের কথা বলা আছে তা না থাকলে এবং খুলার

মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ না পেলে একটি মেয়ের পক্ষে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে কাবিননামার ১৮ নং ঘরে হ্যা যা শব্দটি ছাপানো হয়েছে। যাতে স্ত্রী অপেক্ষাকৃত কম জটিলতায় তালাক-ই-তোফিজের মাধ্যমে মুক্তি পেতে পারে। নিকাহনামার ১৮ নং ঘরটি এজন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পূরণ করা উচিত। অনেকে এ বিষয়টি সম্পর্কে জানেনা এবং ঘরটি শূন্য থাকে। বিয়ে পড়ানোর সময় কাজীদের উচিত দু'পক্ষকে এই ঘরটি সম্পর্কে বিশেষভাবে জানানো ।

[১৮] কারনগুলো হলোঃ i) চার বছর যাবত স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে;

ii) স্বামী দুই বছর যাবত্ স্ত্রীর ভরণপোষণ দানে অবহেলা প্রদর্শন করিলে অথবা ব্যর্থ হইলে;

ii-ক) স্বামী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করলে;

iii) স্বামী সাত বছর বা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হইলে;

iv) স্বামী কোন যুক্তসঙ্গত কারণ ব্যতীত তিন বছর যাবত্ তাহার দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে;

v) বিবাহকালে স্বামীর পুরুষত্বহীনতা থাকিলে এবং উহা বর্তমানেও চলিতে থাকলে;

vi) দুই বছর যাবত্ স্বামী পাগল হইয়া থাকিলে অথবা কুষ্ঠ ব্যাধিতে কিংবা ভয়ানক ধরণের উপদংশ রোগে ভুগিতে থাকলে;

vii) আঠার বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাহাকে তাহার পিতা অথবা অন্য অভিভাবক বিবাহ করাইয়া থাকিলে এবং উণিশ বছর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই সে উক্ত বিবাহ অস্বীকার করিয়া থাকিলে; তবে, অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যে যদি দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে;

viii) স্বামী তাহার (স্ত্রীর) সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করিলে, অর্থাৎ

ক) অভ্যাসগতভাবে তাহাকে আঘাত করিলে বা নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা, উক্ত আচরণ দৈহিক পীড়নের পর্যায়ে না পড়িলও, তাহার জীবন শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে এমন হইলে;

খ) স্বামীর দূর্নাম রহিয়াছে বা কলঙ্কিত জীবন যাপন করে এমন স্ত্রীলোকদের সহিত মেলামেশা করিলে, অথবা

গ) তাহাকে দূর্ণীতির জীবন যাপনে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিলে, অথবা

ঘ) তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে অথবা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান করিলে, অথবা

ঙ) তাহার ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করিলে, অথবা

চ) একাধিক স্ত্রী থাকিলে, সে আলকোরানের নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায়পরায়নতার সহিত তাহার সঙ্গে আচরণ না করিলে;

ix) মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য বৈধ হেতু হিসাবে স্বীকৃত অন্য যে কোন কারণে। তবে অবশ্য- ক) কারাদন্ডাদেশ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত ৩ নং হেতু বাদে কোন ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না, খ) ১ নং হেতুবাদে প্রদত্ত ডিক্রিটি উহার প্রদানের তারিখ হইতে ৬ মাস পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না এবং স্বামী উক্ত সময়ের মধ্যে স্বয়ং অথবা ক্ষমতপ্রাপ্ত কো এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে যদি আদালতকে খুশী করিতে পারে যে, দাম্পত্য কর্তব্য পালনে প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত ডিক্রিটি রদ করিবেন; এবং গ) ৫ নং হেতুবাদে ডিক্রি প্রদানের পূর্বে, স্বামীর আবেদনক্রমে আদালতের আদেশের এক বছরের মধ্যে যে পুরুষত্বহীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে বা তাহার পুরুষত্বহীনতার অবসান ঘটিয়াছে এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আদালত তাহাকে আদেশ দান করিতে পারেন এবং যদি সে উক্ত সময়ের মধ্যে আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত হেতুবাদে কোন ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না।

[১৯] ১ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১০০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ড

[২০] *মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম বনাম মোছাঃ হেলেনা বেগম ও অন্যান্য, সিভিল রিভিশন নং ৬৯৮, হাইকোর্ট বিভাগ*, ১৯৯২

[২১] ধারা ৬(৪) এবং ৯(২), *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ*, ১৯৬১

২২ Begum Asma Siddiqua, *The Family Courts of Bangladesh: An Appraisal of Rajshahi Sadar Family Court and the Gender Issues,* Forum on Women in Security and International Affairs and Bangladesh Freedom Foundation, Dhaka, 2005, p.17

২৩ Ameer Ali, *Mahommedan Law*, Vol. 234, Islamabad, 1979, p. 241; নেলী জামান বনাম গিয়াসউদ্দিন খান, 34 DLR 1982 HCD 221

২৪ *Ibid*

২৫ *Abdul Kadir vs. Salima,* ILR 8 All.149 at p.154

২৬ Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, 4th Ed, Delhi, 1974, p.121

২৭ *Nelly Zaman vs. Giasuddin Khan*, 34 DLR (1982) HCD 221

২৮ According to the Order 21 Rule-32 of Civil Procedure Code, Where the party against whom a decree for the specific performance of a contract, or for restitution of conjugal rights, or for an injunction, has been passed, has had an opportunity of obeying the decree and has wilfully failed to obey it, the decree may be enforced in the case of a decree for restitution of conjugal rights by the attachment of his property, or in the case of a decree for the specific performance of a contract, or for an injunction by his detention in the civil prison, or by the attachment of his property, or by both). See, আইন কমিশন, *বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইনের পর্যালোচনা ও আইন কমিশনের কতিপয় সুপারিশ*, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ০৯ জানুয়ারী ২০১৩, পৃষ্ঠা. ৮।

২৯ *Khodeja Begum & Others vs. Md. Sadeq Sarker*, 18 BLD (1998) 31; 50 DLR HCD 181; *Ibid,* p.9

৩০ *Nelly Zaman vs. Giasuddin Khan*, 34 DLR 1982 HCD 221; *Ibid*

৩১ *Sharmin Hosen Rupa vs. Mizanur Rahman*, 1 BLD (1997) HCD 509; *Ibid*

৩২ 18 BLD (1998) 31; *Ibid*

৩৩ *Md Chan Mia vs. Rupnahar*, 51 DLR (1999) HCD 292; *Ibid*

৩৪ Anwar Ahmed Qadri, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*, New Delhi, 1986, p.370

৩৫ CM Shafqat, *The Muslim Marriage, Dower and Divorce*, Lahore, 1986, p.76; *Abdur Kadir vs. Salima*, ILR 8 All 149 at p.154; এ্যাডভোকেট সিরাজ প্রামাণিক, 'চুমকির দেনমোহরের গল্প ও আইনগত ব্যাখ্যা', *দৈনিক 'সময়ের দিগন্ত'*, 16 February 2017; বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে বর্তমান কাবিননামা বা নিকাহ্‌নামার ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ নং ধারায় দেনমোহর সম্পর্কিত শর্তসমূহ উল্লেখ রয়েছে। ১৩ নং ধারায় মোহরের পরিমান ১৪ নং ধারায় কি পরিমান আশু ও বিলম্বিত এবং ১৫ নং এ বিয়ের সময় দেনমোহরের কোন অংশ পরিশোধ হয়েছে কিনা- যদি হয়ে থাকে তার পরিমান ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। যেখানে নিকাহ্‌নামায় দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই উল্লেখ নাই, সেখানে চাহিবামাত্র সমগ্র অর্থ দেয় বলিয়া ধরতে হয় (ধারা ১০, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ*, ১৯৬১)।

৩৬ B.R Verma, *Islamic Law,* 6th Edition, Law Publishers Private Ltd., India, 1991, P.181.

৩৭ ধারা ১৬ (৩বি), *পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫*

৩৮ *Ahmad Kasim vs. Khatun Bibi* (1933) Cal 27

৩৯ *Mohammad Ibrahim vs. Ma Ma* 1939 Rany 28; তবে দুইটি ক্ষেত্রে আদালত দেনমোহর হ্রাস করে ডিক্রী প্রদান করতে পারে, যেক্ষেত্রে দেনমোহর অপ্রকৃত ও কাল্পনিক বলে স্থির হয় এবং যে ক্ষেত্রে আইন কর্তৃক হ্রাস করার ক্ষমতা প্রদান করা হয।

৪০ *Zakeri Begum vs. Sakina Begum* (1892) 19 IA 157;*Mohomed Sultan Begum vs. Sarajuddin Ahmed* (1936) 161 IC 300

৪১ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যে মেয়েটির বিবাহ হয়েছে ৫০০ টাকা দেনমোহরে ঐ মেয়েটির দেনমোহরের মামলায় বাংলাদেশী আইন বর্তমানেও ৫০০/= টাকার বেশী রায় দিতে পারে না।

[৪২] স্ত্রীকে প্রথমত মোহরানার জন্য একটি Civil মামলা করতে হয়। স্ত্রীর পক্ষে ঐ মামলার ডিক্রী হলে, পরবর্তীতে স্ত্রীকে মোহরানা আদায় করে দেয়ার জন্য একই আদালতে আরো একটি মামলা দায়ের করতে হয়, যা 'Execution Suit' নামে পরিচিত। এই দ্বিতীয় মামলাটির মাধ্যমে আদালত স্ত্রীর মোহরানার অধিকার নিশ্চিত করে।

[৪৩] Md. Abdur Rahim Mia, 'The Right of Dower in Islam and the Socio-economic Context of Bangladesh: A Critical Review', *The Rajshahi University Law Journal,* 2006, Faculty of Law, Rajshahi University, Bangladesh, pp.157-178

[৪৪] কল্যাণ বলতে আইন অনুযায়ী সন্তানের পার্থিব, নৈতিক এবং আধ্যাতিক কল্যাণকে বোঝানো হয়ে থাকে। যা শিশুটির নিরাপত্তার পাশাপাশি সুন্দর ও উত্তমরূপে প্রতিপালনের বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে।

[৪৫] *অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন*, ১৮৯০ এর ধারা-৭ এ বলা হয়েছেঃ Where the Court is satisfied that it is for the welfare of minor that order should be made- (a) appointing a guardian of his person or property, or both, or (b) declaring a person to be such a guardian, the court may make an order accordingly.
(1) An order under this section shall imply the removal of any guardian who has not been appointed by will or other instrument or appointed or declared by the Court.
(2) Where a guardian has been appointed by will or other instrument or appointed or declared by the court, an order under this section appointing or declaring another person to be guardian in his stead shall not be made until the powers of the guardian appointed or declared as aforesaid have ceased under the provisions of this Act.
এই আইনের ১৭ ধারায় আরো বলা হয়েছেঃ (1) In appointing or declaring the guardian of a minor, the Court shall, subject to the provisios of this section, be guided by what, consistently with the law to which the minor is subject, appears in the circumstances to be for the welfare of the minor. (2) In considering what will be for the welfare of the minor, the Court shall have regard to the age, sex and religion of the minor, the character and capacity of the proposed guardian and his nearness of kin to the minor, the wishes, if any, of a deceased parent, and any existing or previous relations of the proposed guardian with the minor or his property. (3) If the minor is old enough to form an intelligent preference, the Court may consider that preference. (5) The Court shall not appoint or declare any person to be a guardian against his will.

[৪৬] ধারা ২৫, *অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন*, ১৮৯০

[৪৭] 38 DLR (APD) 106; Law Commission, *Op.cit*, p.14

[৪৮] 16 DLR 1964; *Ibid*

[৪৯] Dr. Muhammad Faiz-ud-Din, *A Text Book on Islamic Law*, ShamsPublication, Dhaka, 2008, p.141

[৫০] 83 DLR (1994) 399; Law Commission,*Op.cit*, p.14

[৫১] 32 DLR 1981; *Ibid*

[৫২] 18 BLD (HCD) 343; *Ibid*

[৫৩] ধারা ২৫(৩), *অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০*

[৫৪] Law Commission,*Op.cit*, p.14

[৫৫] মুসলিম আইনানুযায়ী যতদিন পর্যন্ত পুত্র সাবালক না হয় এবং কন্যার বিবাহ না হয় ততদিন পিতা সন্তানদের ভরণপোষণ করতে বাধ্য। বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তানারীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার। পিতা অক্ষম ও দরিদ্র হলে মা সন্তানের ভরণপোষণ করবে। বাবা-মা দুজনেই অক্ষম হলে পিতামহের ওপর এ দায়িত্ব বর্তায়। ভরণপোষণের প্রথম ও প্রধান হকদার স্ত্রী। স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীর কাছে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী। স্বামীর সঙ্গতি থাক বা না থাক স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে স্বামী বাধ্য। স্ত্রী ধনী এবং সম্পদশালী হলেও ভরণপোষণের অধিকার বাতিল হয়না।

[৫৬] ধারা ৫, *পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ*, ১৯৮৫; পূর্বে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ভরণপোষণের মামলা দায়ের করা যেত। ২০০৯ সালে ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে এই ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে। দেখুন, *বাংলাদেশ গেজেট*, ৮ এপ্রিল ২০০৯

[৫৭] ধারা ৯, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ*, ১৯৬১

[৫৮] ধারা ২, *মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন*, ১৯৩৯

[৫৯] *Hifjur Rahman vs. Shamsunnahar Begum*, 47 DLR 1995, p.54

[৬০] Advocate Siraj Pramanik, 'Talaq related Cases: Effects and Discussion', available at *www.u71news.com*, accessed on 11 July 2016

[৬১] *Ibid*

[৬২] আইন কমিশন, *Op.cit*.

[৬৩] আল কোরানের সূরা বাকারার আয়াত ২৪১ এ- মাতাহ (mata) দেয়ার বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে। মাতার অর্থ উপহার, যা ইদ্দত কালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দেয়া হয় (51 DLR (1999) AD, P.200)। কিন্তু ভরণপোষণ এবং মাতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

[৬৪] *Hifjur Rahman vs. Shamsunnahar Begum* (47 DLR 1995, p.54) মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত নেয় যে, "স্বামীর অবশ্যই তার তালাক প্রদানকারী স্ত্রীকে এমনভাবে ভরণপোষণ দিতে হবে যা তার জন্য প্রয়োজন, এমনকি ইদ্দতকালিন সময় পার হওয়ার পরেও এই যথাযোগ্য ভরণপোষণ দিতে হবে একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যতদিন পর্যন্ত সেই তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর অন্য কোনো বিয়ে না হয়"। কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের এই রায়কে দেশের সবোর্চ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ দ্বারা রহিত করা হয়। এই একই মামলায় শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে কেবল তিন মাস (৯০ দিন) অর্থাৎ ইদ্দতকালিন সময় পর্যন্ত ভরণপোষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

[৬৫] সূরা ২ আয়াত ২৪১, আল কোরান; Law Commission,*Op.cit*, p.12

[৬৬] AIR 1985 SC 945; *Daniel Lotify vs. Union of India*, 7 SCC 2001 740; *Ibid*

[৬৭] আল কোরানের সূরা বাকারার আয়াত ২৪১ এ- মাতাহ (mata) দেয়ার বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে। মাতার অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে হেফজুর রহমানের মামলায়, এর অর্থ উপহার, যা ইদ্দত কালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দেয়া হয় (51 DLR (1999) AD, P-200)| কিন্তু ভরণপোষণ এবং মাতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

[৬৮] Anisur Rahman, 'Unlocking the gate of ijtihad', Hefzur Rahman revisited, in Dr. Salimullah Khan ed, *Stamford Journal of Law*, Number 2 March 2011, p.160; Law Commission,*Op.cit*, p.12

[৬৯] আরা ৬(৪) *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ*, ১৯৬১

[৭০] আয়াত নং ৩, সুরা নিসা, *আল কোরান*

[৭১] ধারা ৬, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ* ১৯৬১

[৭২] *Ibid*

[৭৩] *Ibid*

[৭৪] প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত বলতে কি বোঝায় তা মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১ তে একটা বিস্তারিত তালিকা রয়েছে যখন বহু বিবাহকে প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত গণ্য করা হবে। সেগুলি হল- বর্তমান স্ত্রীর সন্তান ধারণের অক্ষমতা, শারিরীক প্রতিবন্ধকতা, দাম্পত্য সম্পর্ক পালনে শারীরিক অক্ষমতা, দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধারে আদালতের ডিক্রি না মানা।

[৭৫] ধারা ৬, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ* ১৯৬১

[৭৬] বিধি ৯, কলাম ২১, নিকাহনামা, *বাংলাদেশ মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা* ১৯৭৫

[৭৭] Alomgir Muhammad Siajuddin, *Shari'a law and society: Tradition and Change in the Indian Subcontinent*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1991 p.370

[৭৮] আয়াত নং ৩, সুরা নিসা, *আল কোরান*

[৭৯] দেখুন, *http://www.hrea.org/moudawana.html#24,* last accessed on 29 February 2012

[৮০] দেখুন, *www.e-justice.tn/fileadmin,* last accessed on 5 Jun 2012

[৮১] আবু সালেহ রনি, 'পারিবারিক আদালত আস্থা হারাচ্ছে', *দৈনিক সমকাল*, ২২ মে ২০১৭

[৮২] N.A.M. Jashim Uddin, 'A Legal Analysis with Critical Appreciation Establishment and Operations of the Family Courts in Bangladesh', *The Daily Star*, 5 January 2005

[৮৩] আখতার হামিদ খান , 'নারীর দুর্বিষহ যন্ত্রণা কমাতে পারেনি পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ', *দৈনিক সংগ্রাম*, ০৬ মার্চ ২০১২

[৮৪] ধারা ১০, ১৩ ও ১৪, *পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫;* When the written statement is filed, the family Court shall fix a date ordinarily not more then thirty days for a pre-trial hearing of the suit (section 10). After the close of evidance of all parties, the family Court shall make another effort to effect a compromise or reconciliation between the parties section 13). When a dispute is setteled by compromise or conciliation, the Court shall pass a decree or give decision in the suit in terms of the Compromise or conciliation agreed to between the parties (section 14).

[৮৫] ধারা ১০ ও ১৩, *পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ*, ১৯৮৫

[৮৬] Begum Asma Siddiqua, *The Family Courts of Bangladesh: An Appraisal of Rajshahi Sadar Family Court and the Gender Issues,* Forum on Women in Security and International Affairs and Bangladesh Freedom Foundation, Dhaka, 2005, p. 36

[৮৭] High Court circular, Memo no 1 (General), 1988/memo no 6(G), dated 7 February 2001; Memo no. 59 (ka), dated 23 June 2003; ২০০৯ সালে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল যাতে উল্লেখ ছিল যে, একজন সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ এবং যুগ্ম জেলা জজকে প্রতি মাসে অন্তত ছয়টি স্বত্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করবে।

[৮৮] SK M Tofayel Hasan, 'Critical Scarring on Civil Litigation: Bangladesh Perspective', *ASA University Review* 2013, ASA University, Dhaka, p.131.

[৮৯] ৫টি বিষয় হলো বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, দেনমোহর, ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্ব ও সন্তানের জিম্মা

[৯০] 42 (1990) DLR (HCD) 450

[৯১] 14(1994) BLD (HCD) 467

[৯২] 50 DLR (HCD) 47

[৯৩] মামলা ও অভিযোগ দায়ের, সমন ও নোটিশ জারী, লিখিত বক্তব্য, পক্ষগণের অনুপস্থিতির ফলাফল, সাক্ষ্যপ্রমাণ নথিভুক্তিকরন, রায় লিখন, সাক্ষীদের প্রতি সমনজারী ইত্যাদি

[৯৪] 1 BLC 1996 (AD) 24

[৯৫] 47 DLR 1995 (HCD) 235

[৯৬] 47 DLR (HCD) 331

[৯৭] 40 DLR 305 HCD

[৯৮] 40 DLR 305 HCD

[৯৯] বিষয়গুলো হলো বিবাহবিচ্ছেদ, দেনমোহর, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, ভরণপোষণ এবং সন্তানের অভিভাবকত্ব ও জিম্মাদারি।

[১০০] 14 (1994) BLD 415

[১০১] 14 (1994) BLD (HCD) 413

[১০২] 14 (1994) BLD (HCD) 467

[১০৩] 47 DLR (1998) HCD 50

[১০৪] এস.এম. আতিয়া নাজনীন, 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫: শুধুই কি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য', available at *http://www.askbd.org,* last accessed on 25 June 2019

[১০৫] *Ibid.*

[১০৬] কোন লোকের মাতার সহিত এক লোকের আইনতঃ সিদ্ধ বিবাহ কায়েম থাকাকালে, কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের পর দুইশত আশি দিনের মধ্যে তাহার মাতা অবিবাহিতা থাকাকালে যদি তাহার জন্ম হইয়া থাকে, এবং যদি না প্রমাণিত হয় যে, ঐ লোক যখন মাতৃগর্ভে আসিয়া থাকিতে পারে, অনুরূপ কোন সময়ে বিবাহিত পক্ষদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে মিলনের পথ উন্মুক্ত ছিল না, তবে জন্মের ঘটনা দ্বারা অবশ্যই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইবে যে, সে তাহার মাতার সহিত বিবাহিত উক্ত লোকের বৈধ সন্তান।

[১০৭] In these exceptional cases when non access was proved child born after normal duration of gestation was found legitimate in *State vs. Domish*, 191 N.W 1002 (Minn.1923)-325 days, Minnesota Court, USA; in *Egnoi vs. Egnoi,* 86 A.2d 272 (N.J Super. 1952)-301 days, New Jersey, USA. It was observed in the *The State of Washington vs. Victor Schmschal* (No.39926 Dept.2; 73 Wn.2D 141) by the Supreme Court in 1968 that the extreme limit for gestation period is 334 days. Even around our social affiliation in Bangladesh there are many instances when we see a child is born both before and after the set limit of 280 days in section 112 of the Evidence Act. See also Begum Asma Siddiqua, *The Family Courts of Bangladesh: An Appraisal of Rajshahi Sadar Family Court and the Gender Issues,* Forum on Women in Security and International Affairs and Bangladesh Freedom Foundation, Dhaka, 2005, p.82

[১০৮] পারিবারিক আইনে স্ত্রী এবং সন্তানের ভরণপোষণের বিধান রয়েছে। সাধারণত স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর এবং সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব বাবার ওপর ন্যস্ত। অনেক সময় স্ত্রী তার বিয়েবিচ্ছেদের পরও স্বামীর কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভরণপোষণ দাবি করতে পারেন। কিন্তু বাবা-মা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কার ওপর অর্পিত হবে, এ আইনে সে সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। দেখুনঃ সিরাজ প্রামাণিক, 'পিতামাতার ভরণপোষণ আইন', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ০২ আগস্ট ২০১৬

[১০৯] ধারা ৭, *পিতামাতার ভরণপোষণ আইন*, ২০১৩

[১১০] সিরাজ প্রামাণিক, 'পিতামাতার ভরণপোষণ আইন', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ০২ আগস্ট ২০১৬

[১১১] ধারা ৭ (২), *Ibid*

[১১২] ধারা ১০ এবং ১৫, *পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন*, ২০১০। এই আইন ১০ ধারা নারীদের যৌথ গৃহে বাস করার অধিকার দেয় এবং ১৫ ধারা আদালতকে এই অধিকার কার্যকরের জন্য বসবাসের অধিকারের আদেশ দেবার ক্ষমতা দেয়। এই আইনে পারিবারিক নির্যাতন হিসেবে সে সকল কার্যকে বুঝায় যা "অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ"। এগুলির মধ্যে রয়েছে সেই ধরনের বিষয় যেখানে স্বামী তার স্ত্রীকে সম্পত্তি ব্যবহার ও পরিচালনা হতে দূরে রাখে যে সম্পত্তির অধিকারী সে পারিবারিক সম্পর্কের কারণেই, তার দৈনন্দি দন চাহিদাকে অস্বীকার করে এবং বিয়ের সময় উপহার হিসেবে যা পেয়েছে তা ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করে।

[১১৩] বিবাহ চলাকালীন সময়ে দম্পত্তিতে অর্জিত যৌথ সম্পত্তি বা তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ণয় এবং বিভাজনে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এটাকে সমষ্টিগত সম্পত্তি বলা হয়। যেখানে ধরেই নেওয়া হয় যে, বিবাহ চলাকালীন সময়ে অর্জিত সকল সম্পত্তিতেই স্বামী-স্ত্রীর যৌথ মালিকানা রয়েছে। সমষ্টিগত সম্পত্তির পদ্ধতিতে সাধারণত বিবাহ পূর্বের উত্তরাধিকার বা উপহারসূত্রে কোন উপায়ে অর্জিত সম্পত্তিকে পৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধরা হয়। কিছু কিছু দেশে "সমষ্টিগত সম্পত্তি এবং "পৃথক সম্পত্তি" দুইটা পদ্ধতিই রয়েছে এবং এখানে দম্পত্তিদেরকে বিয়ের সময়ই তারা কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে সেটা নির্ধারণ করার অনুমতি দেয়। কিছু কিছু দেশে পৃথক সম্পত্তি পদ্ধতি আছে কিন্তু তার যৌথ প্রয়াস এবং যৌথ অংশীদারীত্বের মাধ্যমে অর্জিত দাম্পত্য সম্পত্তির স্বীকৃতি দেয় এবং সেই সম্পত্তির বিভাজন ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের কতটুকু অবদান রয়েছে সেটা বিবেচনা করে কিছু জায়গায় যেম ফিলিফাইন এবং ইন্ডিয়ার গোয়া রাজ্যতে সম্পূর্ণ সমষ্টিগত সম্পত্তির পদ্ধতি যেখানে সকল সম্পত্তির যৌথ সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে তা সে বিয়ের আগে বা বিবাহ চলাকালীন সময়, যখনই অর্জিত হোক না কেন।

[১১৪] মালেশিয়াতে ১৯৮৪ সালের ইসলামিক পারিবারিক আইনের (ফেডারেল টেরিটোরিজ) ৫৪ ধারা তালাকের সময় মুসলিম দম্পতিদের সম্পত্তি বন্টনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। ৫৮ ধারা আদালতকে বিবাহকালীন সময়ে অর্জিত সম্পত্তি বা বিবাহপূর্ব অবস্থায় থাকা কোন পক্ষের সম্পত্তি যেটির মূল্য পরবর্তীতে অন্যপক্ষ বা দুইপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় 'মোটামুটিভাবে বৃদ্ধি' পেয়েছে, সেসকল সম্পত্তি বন্টনের ক্ষমতা দেয়। এই সম্পত্তি বন্টনের সময় আদালত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করবেন যার মধ্যে রয়েছে "অর্থ, সম্পত্তি বা শ্রমের মাধ্যমে দেওয়া প্রত্যেক পক্ষের অবদানের পরিমাণ", এবং এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই "আদালত পরিবারের সম্পত্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমবন্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন"। একই ধরনের বিধান রয়েছে মালেশিয়ান ল' রিফর্ম আইন

(বিবাহ ও তালাক) ১৯৭৬ এর ৭৬ ধারায়, যেটি মালয়েশিয়ার অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য (*www.agc.gov.my,* accesed on 29 February 2012)। সিঙ্গাপুরে মুসলমান দম্পতিদের বৈবাহিক সম্পত্তি বন্টনের বিষয়টি ১৯৬৬ সালের এডমিনিস্ট্রেশন অব মুসলিম ল' এ্যাক্ট (২০০৯ সালের অক্টোবরে সংশোধিত) অনুযায়ী পরিচালিত হয় (*www.statutes.agc.gov.sg,* accesed on 5 June 2012)। তিউনিশিয়াতে ১৯৯৮ সালের ৯৮-৯১ নং আইন 'লজ অন দি রিজিম অফ কমিউনিটি অফ প্রপার্টি বিটুইন স্পাউজেস'- এর অনুচ্ছেদ ১ স্বামী-স্ত্রীকে বিবাহের সময় বা বিবাহ পরবর্তীতে কোন একটি গোষ্ঠীগত সম্পত্তির ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার দেয় *(www.jurisitetunisie.com/ tunisie/codes/*, accesed on 29 February 2012)। মরক্কোতে 'দি মরোক্কান ফ্যামিলি কোড (মৌদাওয়ানা) ২০০৪' -এর ৪৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী দুই পক্ষই পৃক পৃক সম্পত্তির মালিক, তবে তারা বিবাহিত অবস্থায় অর্জিত সম্পত্তির বন্টন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটা আলাদা চুক্তি করে নিতে পারেন। এ ধরনের কোন চুক্তি না থাকলে সম্পত্তি বন্টনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনতে হবে -"স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের শ্রম, পারিবারিক সম্পত্তির উনড়বয়নে উভয় পক্ষের নিবেদিত কর্মপ্রচেষ্টা ও দায়-দায়িত্ব" ইত্যাদি (*www.hrea.org/moudawana.html*, accesed on 29 February 2012)। ইন্দোনেশিয়াতে ১৯৭৪ সালের বিবাহ আইন (১নং আইন) এর অনুচ্ছেদ ৩৫ অনুসারে বৈবাহিক সম্পত্তির বিষয়াদি পরিচালিত হয়। ৩৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিবাহের সময় অর্জিত সম্পত্তির মালিকানা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের। তবে স্বামী বা স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি কিংবা তাদের মধ্যে কেউ যদি উপহার হিসেবে কোন সম্পত্তি পেয়ে থাকেন সেগুলি সংশ্লিষ্ট পক্ষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি না তারা সেসব সম্পত্তির বিষয়ে অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেন *(www.sdm.ugm.ac.id*, last accesed on 14 December 2011)। তুরস্কে দেওয়ানী কার্যবিধি ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ১৮৬-২৩৭, পৃষ্ঠা ১৭৩ (উইমেন লিভিং আন্ডার মুসলিম লজ্ পুস্তকে 'Knowing Our Rights: Women, family laws and customs in the Muslim World, 2006' শিরোনামে যেভাবে উল্লেখিত আছে) অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পত্তি বন্টনের বিষয়গুলি পরিচালিত হয় (*www.wluml.org/sites/ wluml.org/files/import/english/pubs/pdf*, last accesed on 29 February 2012)। ফিলিপাইনের মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পত্তির বিষয় সং[illegible]ান্ত আইনের জন্য দেখুন - দি কোড অফ মুসলিম পারসোনাল ল'জ অফ দি ফিলিপিন্স, প্রেসিডেন্সিয়াল ডি[illegible] নং- ১০৮৩ এর অনুচ্ছেদ ১৪, ৩৭ এবং ৩৮ *(www.chanrobles.com/presidentialdecreenom*, accesed on 5 June 2012)।

[১১৫] *The Family Courts Act*, 1984 of India

[১১৬] আইন কমিশন, *Op.cit*, পৃষ্ঠা.১৫

[১১৭] *The Hindu Adoption and Maintenance Act*, 1956

[১১৮] দিদারুল আলম, 'দত্তক আইন না থাকায় উত্তরাধিকার বঞ্চিত হচ্ছে দত্তক শিশুরা', দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জুন ২০১৩

[১১৯] আইন কমিশন, *Op.cit,* পৃষ্ঠা. ১৬

[১২০] *Ibid*.

[১২১] এই মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবেঃ সম্পর্কের সময়কাল; দম্পতির নির্ভরশীল পক্ষের শিক্ষালাভ এবং উপার্জন ক্ষমতার উপর পরিবারের শিশু পরিচর্যা ও সাংসারিক দায়-দায়িত্বের প্রভাব; প্রত্যেক পক্ষের বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত আয়; নির্ভরশীল পক্ষের (স্ত্রীর) নিজেকে নিজে ভরণপোষণের সামর্থ্য; স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য এবং বয়স; নির্ভরশীল পক্ষের চাহিদা এবং জীবনযাত্রার মান; জীবন-জীবিকার অন্যান্য উপায়; এবং অপর পক্ষের পেশাগত উন্নয়নে নির্ভরশীল পক্ষের অবদান।